কিশোরদেরই জন্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ
কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৩

ISBN 81-85547-35-1

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

ভস্তকের পক্ষে সুব্রত দত্তগুপ্ত কর্তৃক ৭৯ মহাত্মা
গান্ধী রোড, কলকাতা: ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত
এবং নন্দন অফসেট ২৯ জাস্টিস মন্মথ
মুখার্জি রো, কলকাতা: ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত

মূল্য : ২৫·০০

উপন্যাস

গল্প

কবিতা ও ছড়া

উপন্যাস

অন্ধকারে সবুজ আলো

সেদিন সকালবেলাতেই বিমান খবর পেল যে তার বন্ধু স্বপন গতরাত থেকেই অজ্ঞান হয়ে আছে। এখনও জ্ঞান ফেরে নি।

সবেমাত্র বালিগঞ্জ লেকে সাঁতার কেটে বাড়িতে ফিরেছে বিমান। সামনের মাসে বাঙ্গালোরে সাঁতারের কম্‌পিটিশনে যোগ দিতে যাবে। লেক থেকে বাড়ি ফিরে রোজই সে আর একবার কলের জলে স্নান করে নেয়। সেদিনও বাড়ি ফিরে বাথরুমে ঢুকতে যাচ্ছিল, এমন সময় প্রিয়ব্রতর ফোন এল।

"কী রে বিমান, লেক থেকে ফিরলি কখন? শোন্‌, কতক্ষণে রেডি হতে পারবি?"

"কে, প্রিয়দা? কেন, রেডি হব কেন? কোথায় যেতে হবে বলত।"

"আমি এক্ষুণি বেরুচ্ছি। গিয়ে বলব।"

"কিন্তু কোথায় যাব এখন? আমার তো আজ কলেজ আছে।"

"কলেজে আজ আর যাওয়া হবে না। একবার দক্ষিণেশ্বরে যেতে হবে রে!"

"দক্ষিণেশ্বরে? হঠাৎ এই সকালবেলা?"

"কেন, তুই শুনিস নি কিছু? স্বপনের যে এখনও জ্ঞান ফেরে নি রে!"

"স্বপন? আমাদের স্বপন? জ্ঞান ফেরে নি মানে? কী হয়েছে ওর?"

স্বপনের ঠিক যে কী হয়েছে, তা প্রিয়ব্রতও জানে না। সারারাত স্বপন অজ্ঞান হয়ে আছে, এইটুকুই শুধু সে জেনেছে। স্বপনের মামা প্রিয়ব্রতকে আজ ভোরে ফোন করেছিলেন। শুধু বোঝা গেল তিনি খুব ভয় পেয়ে গেছেন।

স্বপনদের বাড়ি ভবানীপুরে। কিন্তু কয়েকদিন ধরে স্বপন দক্ষিণেশ্বরে তার মামার বাড়িতে রয়েছে, এ খবর বিমান জানত। সেই জন্যেই স্বপনের সঙ্গে বিমানের দেখা হয় নি এ-ক'দিন। পাঁচদিন ছুটি থাকার পর আজই ওদের কলেজ খুলছে।

ঝাঁ করে স্নান সেরে, চট্‌পট্‌ দু'খানা টোস্ট আর একটা ডিম সেদ্ধ খেয়ে নিয়ে বিমান জামা-প্যান্ট পরে জুতোয় ফিতে বাঁধছে এমন সময় প্রিয়ব্রতর গাড়ির হর্ন বেজে উঠল রাস্তায়। তিনতলার বারান্দা থেকে বিমান হাত নেড়ে "আসছি" বলেই ঝড়ের বেগে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

প্রিয়ব্রত বি· এ· পাশ করার পর পুলিশে চাকরি পেয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন করার পর তার আর ও-চাকরি ভাল লাগল না। তখন ঐ চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা বেশ বড় কোম্পানিতে সিকিউরিটি অফিসারের কাজ নিয়েছিল। কিন্তু সে চাকরিতেও তার মন টিকল না। বাঁধাধরা কোনো কাজই তার পছন্দ হয় না। এখন তাকে বরং বেকারই বলা যায়। তবে ওদের অবস্থা বেশ ভালো। এর মধ্যে কোথায় যেন একটা নিলাম থেকে সে একটা পুরোনো জিপ্‌ গাড়ি কিনে সেটাকে সারিয়ে টারিয়ে টক্‌টকে লাল রং করে নিয়েছে। প্রায়ই সে বলে এই গাড়িটা নিয়ে সে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়বে।

স্বপন আর বিমানকেও সে সঙ্গী হিসেবে নিতে রাজি। কিন্তু সত্যি সত্যি কবে যে যাওয়া হবে, তার ঠিক হয়নি এখনও।

জিপের স্টিয়ারিং-এর সামনে বসে শিস্ দিয়ে প্রিয়ব্রত একটা গান গাইছিল। বিমান এসে তার পাশে বসতেই জিপে স্টার্ট দিল। এখান থেকে দক্ষিণেশ্বর অনেক দূরের পথ।

জিপটা চলতে শুরু করতেই বিমান জিজ্ঞেস করল, "প্রিয়দা, স্বপন হঠাৎ কেন অজ্ঞান হয়ে গেল সে কথা ওর মামা কিছু জানান নি তোমায়? অমন সুস্থ, সবল ছেলে!"

"না। মনে হচ্ছে, ওর মামার বাড়ির কেউ-ই কারণটা ঠিক বুঝতে পারেন নি। কোনো জায়গা থেকে পড়ে যায় নি, মাথায় কেউ ডাণ্ডাও মারে নি। শরীরে কোনো চোট নেই। হঠাৎ অজ্ঞান! তা-ও একেবারে সারারাত ধরে অজ্ঞান! হ্যাঁরে, তুই কি জানিস, স্বপন আগে কখনও এরকম অজ্ঞান হয়েছে?"

"না তো।"

"এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকাটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, ভয়েরও। ওকে হাসপাতালে পাঠানো উচিত ছিল।"

"ওকে অজ্ঞান অবস্থায় কোথায় পাওয়া গেছে?"

"ছাতে।"

দক্ষিণেশ্বরে স্বপনের মামারবাড়ির ছাতের দৃশ্যটা মনে পড়ল বিমানের। সে ওখানে কয়েকবার গেছে। দেখবার মতন ছাত একটা। পুরনো আমলের বাড়ি, মস্ত বড় ছাত। সেখানে অন্তত দেড়শোটা নানা জাতের ফুলের টব। কত রকমের ফুলই না রয়েছে সেখানে! বেশির ভাগ ফুলেরই নাম জানে না বিমান। স্বপন অবশ্য জানে। স্বপন গাছপালা খুব ভালোবাসে। ঐ ছাতের বাগানটার জন্যেই স্বপন মাঝে মাঝেই মামার বাড়িতে যায়। ছাতের মাঝখানে খড়ের ছাত দেওয়া একটা ঘর আছে। মামার বাড়িতে থাকার সময় সেখানে বসেই স্বপন পড়াশুনো করে।

প্রিয়ব্রত একটু পরে বলল, "শুনলুম, কাল দুপুরেই নাকি ওখানকার একটা ছেলের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল স্বপনের।"

বিমান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "স্বপন ঝগড়া করেছিল? যাঃ!"

স্বপনের চেহারা রোগা পাতলা, মাথার চুল কোঁকড়া কোঁকড়া, চোখে পুরু লেন্সের চশমা। ঐ চশমা ছাড়া স্বপন প্রায় দেখতেই পায় না। স্বপন সব সময় হাসিঠাট্টা করতে আর মজা ক'রে কথা বলতে ভালোবাসে, কখনও রেগে যায় না। সেই স্বপন কারও সঙ্গে ঝগড়া করেছে, এ কথা শুনলে তো আশ্চর্য হতেই হয়।

প্রিয়ব্রত বলল, "ওদের পাড়ায় গুণ্ডা মতন কিছু ছেলে আছে জানিস তো? তাদের কাজই হলো লোকের সঙ্গে পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া করা। সেই রকমই একটা ছেলে—"

"কিন্তু তারা ঝগড়া করতে চাইলেও স্বপন তো উল্টে ঝগড়া করার ছেলে নয়!"

"শোন্ না! দুপুরবেলা স্বপন ঐ ছাতের ঘরে বসে বই পড়ছিল। এক সময় সামনের রাস্তায় খুব চ্যাঁচামেচি হচ্ছে শুনে সে উঠে এসে রেলিং দিয়ে উঁকি মারল। রাস্তায় কতকগুলো বেশ বড় বড় ছেলে তখন ক্যাম্বিস বল্ দিয়ে ক্রিকেট খেলছিল। স্বপনকে দেখতে পেয়েই তারা বলল, তাদের বল্‌টা ওভারবাউণ্ডারি হয়ে ওদের ছাতে চলে এসেছে। সেটা ফেলে দিতে বলল তারা। স্বপন এতক্ষণ বই পড়ছিল মন দিয়ে, বল্‌টা পড়েছে কিনা টেরই পায়নি। তাছাড়া অতবড় ছাতের কোনো একদিকে বল্ পড়লে টের না পেতেও পারে। সে খোঁজাখুঁজি করেও বল্‌টা পেল না। চেঁচিয়ে ওদের বলল, যে বল্‌টা পাওয়া গেল না। বোধহয় উড়ে অন্য কোথাও গিয়ে পড়েছে। কিন্তু রাস্তার ঐ ছেলেগুলো শুনবে কেন সে কথা? ওরা বললে যে ওরা নিজেরা এসে দেখতে চায়। ওদের বাধা দেবারও উপায় নেই? ওরা উঠে এল ছাতে—"

হঠাৎ প্রিয়ব্রত ঘ্যাচ্ করে ব্রেক কষল। রাস্তার মাঝখানে ড্রপ খাচ্ছে একটা ক্যাম্বিস বল্, আর সেটা ধরার জন্য পাগলের মতন ছুটে আসছে একটা ছেলে। দেখা গেল ডান পাশের গলিতে ইটের উইকেট সাজিয়ে ক্রিকেট খেলা চলছে।

ছেলেটা বল্‌টা কুড়িয়ে নিয়ে যাবার পর প্রিয়ব্রত আবার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, "শীত কবে শেষ হয়ে গেছে, এখনো পাড়ায় পাড়ায় গলির মধ্যে ক্রিকেট খেলা চলছে! মনে হয় ভিশি কি গাভাসকর কি কপিলের অভাব হবে না আমাদের দেশে!" তারপর একটু দুঃখের সুরে বলল, "কত ছেলে যে চাপা পড়ে এই ভাবে!"

"প্রিয়দা, তুমি কখনও গলিতে ক্রিকেট খেলেছ?"

"খেলেছি বই কি। উপায় কি বল্, কলকাতায় কটাই বা খেলার মাঠ আছে!"

"যাক্‌গে, এখন বলো স্বপনের ওখানে কী হলো তারপর? এতসব কথা তোমায় জানালই বা কে?"

"স্বপনের ছোটমামা ইন্দ্রবাবু তিনিই তো আমায় টেলিফোন করেছিলেন। তুই হয়তো জানিস না, ঐ ইন্দ্রদার কাছে আমি পড়েছি এক সময়। ইন্দ্রদার ধারণা, আমি এখনও পুলিশে কাজ করি।"

"বুঝেছি। তারপর?"

"ছেলেগুলো তো ছাতে এসে বল্‌টা খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। কিছুতেই আর পায় না। ওদের ছাতে অত ফুল গাছ, তার মধ্যে কোথায় যে লুকিয়ে আছে বল্‌টা! খুঁজে পাওয়া সত্যিই শক্ত!"

"তাতে স্বপনের সঙ্গে ওদের ঝগড়া হবে কেন?"

"ওদের ধারণা হল, স্বপন বল্‌টা লুকিয়ে রেখে, ইচ্ছে করেই ওদের দিচ্ছে না।"

"স্বপন তা করতেই পারে না।"

"সে তো তুই বলছিস। কিন্তু ওদিকে ব্যাপারটা কি হলো জানিস, স্বপন ওদের সঙ্গে রসিকতা করতে গিয়েই মুস্কিল বাধাল। ওদের মধ্যে বেশ একটা ষণ্ডা-গুণ্ডা মতন চেহারার ছেলের হাতে ছিল ব্যাট। স্বপন তাকে বলল, আপনিই বল্‌টা মেরেছিলেন তো? আপনার যা চেহারা, তাতে মনে হয় আপনি এত জোরে

হাঁকড়েছিলেন যে বল্‌টা এতক্ষণে উড়তে উড়তে স্বর্গে পৌঁছে গেছে! সেই কথা শুনে রেগে গেল ছেলেটা, বলল, খুব তো দাঁত বের করে কথা বলা হচ্ছে। এখন বল্‌টা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ, বার করো তো চাঁদু! স্বপন তার উত্তরে আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ যে একটা ফুটকি দেখতে পাচ্ছেন, ও—ই যে...... মনে হচ্ছে আপনার বল্‌টা এখনো স্বর্গের দিকে ছুটে চলেছে'!"

"স্বপনের এই রকম ইয়ার্কি করাই তো স্বভাব!" বলল বিমান।

"কিন্তু সবাই তো ইয়ার্কি বোঝে না, আর হাসতেও জানে না! রেগে যাওয়া বরং সহজ। স্বপনের কথা শুনে সেই ছেলেটা রেগে গর্‌গর্‌ করতে লাগল। ওদিকে অন্য ছেলেরা বল্‌টা খুঁজতে গিয়ে ততক্ষণে ফুলগাছগুলো একেবারে তছনছ করেছে, দু'একটা টব উল্টেও দিয়েছে। তাই দেখে স্বপন ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, আপনারা এভাবে গাছ নষ্ট করছেন কেন? পুরনো বল্‌টা গেছে যাক, আপনাদের আমি একটা নতুন বল্‌ কেনার পয়সা দিয়ে দিচ্ছি। যে-ই না এই কথা বলা, অমনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল সেই ছেলেটা। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, বড্ড যে টাকার গরম দেখাচ্ছ চাঁদ! আমাদের চেননা দেখছি। বল্‌টা এক্ষুণি বের করো, নইলে তোমার মুণ্ডুটা নিয়েই আজ ক্রিকেট বল বানাব!"

বিমান হেসে উঠল।

প্রিয়ব্রত বলল, "তুই হাসছিস! কিন্তু ঐ সব ছেলেদের বিশ্বাস নেই, যখন খুশি যা-তা কোনো কাণ্ড করে ফেলতে পারে।"

বিমান বলল, "স্বপন শান্ত ছেলে, কিন্তু আমি হলে তক্ষুণি ঐ ছেলেটার মুখের মতো জবাব দিয়ে দিতুম। হ্যাঁ, তারপর কী হলো?"

"তারপর স্বপনের ছোট মামা এসে ছেলেগুলোকে বল্‌ কেনবার জন্যে পাঁচটা টাকা দিলেন। ওরা টাকাটা নিল ঠিকই, কিন্তু স্বপনের ওপর ওদের রাগ রয়েই গেল। যাবার সময় সেই ছেলেটা স্বপনকে বলে গেল, বিকেলের মধ্যে আমাদের বল্‌টা যদি ফেরৎ না পাই, তা হলে দেখো তোমার কী হয়!"

"এবার বুঝলুম, ইন্দ্রমামা কেন সকালবেলা তোমাকেই ফোন করেছিলেন।"

"ওরা বরানগর থানাতেও খবর দিয়েছেন। আমিও ওখানকার থানায় খবর নিলুম। ও· সি· আমার চেনা। ও· সি· আমায় বললেন, স্বপনদের মামার বাড়ির পাড়ায় ছোট এককড়ি নামে একটা উঠতি মস্তান আছে। খুব রগ-চটা, মারামারি ক'রে একবার জেলও খেটেছে। কিন্তু সে যে স্বপনদের কোনো ক্ষতি করেছে, তার কোনো চিহ্ন বা প্রমাণ নেই। ছেলেটা শুধু মুখে ভয় দেখিয়েছে, আর কিছু করে নি। স্বপনও কাল সারাদিনে একবারও বেরোয় নি বাড়ি থেকে।"

"স্বপন কাল অজ্ঞান হয়েছে কখন?"

"রাত সাড়ে নটা-দশটার সময়! ওদের বাড়িতে শিবু ব'লে একটা ছেলে কাজ করে। সে ছাতে এসেছিল স্বপনকে খাবার জন্যে ডাকতে। এসে দেখল ছাতের ঘরটার ঠিক দরজার সামনেই মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে স্বপন। অনেকবার ডেকেও সাড়া

না পেয়ে সে—"

গাড়িটা আবার আটকাল শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে। ট্র্যাফিক জ্যাম। ওদের জিপটার ঠিক গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিরাট গাড়ি। সে-গাড়িতে এক ভদ্রলোকের পাশে বসে আছে একটা ন'-দশ বছরের ছেলে। বোধহয় স্কুলে যাচ্ছে। বাচ্ছা ছেলেটি জিপটার দিকে দেখিয়ে বলল, "বাবা, দ্যাখো, কী রকম লাল টুক্‌টুকে জিপ গাড়ি। আমার ঐ রকম একটা খেলনা জিপ আছে না?"

প্রিয়ব্রত ছেলেটির দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

বিমান বলল, "সত্যি, প্রিয়দা, তুমি গাড়িটার এমন রং করেছ, ঠিক যেন মনে হয় ডিংকি টয়। সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে!"

প্রিয়ব্রত বলল, "আমি তো তাই-ই চাই!"

একটু বাদে গাড়িটা শ্যামবাজার পেরিয়ে বি· টি· রোড ধরে ছুটতে লাগল।

বিমান জিজ্ঞেস করল, "পুলিশ কি এই ছোট এককড়ি না কী যেন ঐ ছেলেটাকে ধরেছে?"

প্রিয়ব্রত বলল, "ধরবে কেন? বিনা প্রমাণে পুলিশ কারুকে ধরে রাখতে পারে? পুলিশ ভোরবেলা ওর কাছে গিয়ে কিছু কথা জিজ্ঞেস করে এসেছে। ছোট এককড়ি বলেছে, সে কিছু জানে না। সামান্য একটা ক্যাম্বিসের বলের জন্য সে কি কাউকে মারতে পারে?"

"ধরো, এমন তো হতে পারে, ঐ ছোট এককড়ি বা অন্য কেউ চুপি চুপি সন্ধ্যের পর ও-বাড়ির ছাতে উঠে এসে স্বপনকে কিছু দিয়ে মেরে অজ্ঞান করে পালিয়েছে!"

"তুই তো আচ্ছা বুদ্ধু! মারলে দাগ থাকবে না? রক্ত বেরবে না? সে-সব কিছুই নেই।"

"শুনেছি রবারের ডাণ্ডা কি বালির বস্তা দিয়ে মারলে কোনো দাগ থাকে না, রক্তও বেরোয় না, কিন্তু খুব লাগে।"

"ধুৎ! ওসব তো পুলিশী মার। এই সব রগ-চটা ধরনের গুণ্ডা ছেলেরা ঝগড়ার সময় হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে দুম্‌ করে মেরে বসে। পরিকল্পনা ক'রে, বুদ্ধি খাটিয়ে মারা ওদের স্বভাব নয়। তা ছাড়া যে-সব ছেলে ক্রিকেট খেলে, তারা কখনও কখনও মারামারি করতে পারে বটে, কিন্তু মানুষ খুন করে না।"

"খুন?"

"স্বপন বারো ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে আছে। যদি এমন মার কেউ মারে, যাতে একজনকে বারো ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে থাকতে হয়, তা হলে তো সে খুনও হয়ে যেতে পারে।"

বিমান হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

জিপটা এবার দক্ষিণেশ্বরের দিকে বাঁক নিল। খানিকক্ষণ বিমান কোনো কথাই বলছিল না। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "একটানা বারো ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে থাকা খুব খারাপ, তাই না প্রিয়দা?"

প্রিয়ব্রত উত্তর দিল, "খারাপ তো বটেই!"

স্বপনের মামার বাড়ির গলিটার মুখেই একটা চায়ের দোকান। প্রিয়ব্রতর জিপটা যখন ওখানে পৌঁছল তখন ঐ দোকানটার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল কতকগুলো ছেলে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় বেকার। বিমান আর প্রিয়ব্রত দু'জনেই তাকাল ওদের দিকে। কে জানে এই ছেলেদের দলটাই হয়তো কাল গলিতে ক্রিকেট খেলছিল। এদের মধ্যেই বোধহয় কারুর নাম ছোট এককড়ি। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল ফিসফিস করে। স্বপন যে অজ্ঞান হয়ে আছে, সে কথা ওরা নিশ্চয়ই জানে। সেই কথাই বোধ হয় বলাবলি করছে—ভাবল বিমান।

জিপটা থামল একটা লোহার গেটওয়ালা বাড়ির সামনে। আরও দুটো গাড়ি তখন সেখানে দাঁড়িয়ে, তার মধ্যে একটা গাড়ি ডাক্তারের। প্রিয়ব্রত আর বিমান জিপ থেকে নেমে আস্তে আস্তে ঢুকল বাড়ির মধ্যে।

বাড়িতে তখন অনেক লোকজন। ভবানীপুর থেকে স্বপনের বাবা-মা এসে পড়েছেন। এখানকার একজন ডাক্তার তো রয়েছেনই, স্বপনের বাবাও তাঁদের আত্মীয় একজন বড় ডাক্তারকে এনেছেন সঙ্গে করে। দুই ডাক্তার বসে আছেন স্বপনের খাটের দু' পাশে।

স্বপন শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। চোখ দুটো বোজা, ঠিক মনে হয় যেন ঘুমিয়ে আছে। স্বপনের দিকে তাকিয়েই বিমানের মনে হলো, স্বপনকে যেন একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে। কী যেন একটা পরিবর্তন হয়েছে তার মুখে! কিন্তু সেটা যে কী তা বিমান ঠিক ধরতে পারল না। স্বপনের চোখে এখন চশমা নেই, সেই জন্যেই কি ঐ রকম দেখাচ্ছে তাকে?

অসুস্থ লোকের কাছে গেলেই লোকে একবার তার কপালে হাত ছোঁয়ায়। বিমানও স্বপনের শিয়রের কাছে গিয়ে তার কপালে হাত রাখল। নাঃ, স্বপনের জ্বর নেই, কপালটা বেশ ঠাণ্ডা।

বিমান স্বপনের মাথাটা ধরে জোরে নাড়িয়ে ডাকল, "স্বপন, এই স্বপন!"

একজন ডাক্তার বললেন, "উঁহু, ওরকম করো না, ওতে লাভ হবে না।"

প্রিয়ব্রত বলল, "ওকে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, কাকাবাবু?"

স্বপনের বাবার সঙ্গে যিনি এসেছেন, সেই ডক্টর সোম বললেন, "আমার তো তাই মনে হয়।"

স্বপনের বাবা তাকালেন স্বপনের বড় মামার দিকে। বড় মামা হাসপাতাল টাসপাতালের মতন জায়গাগুলোকে খুব ভয় পান। ওঁর ধারণা, হাসপাতালে কেউ একবার গেলে সে আর বাড়ি ফেরে না। তিনি বললেন, "কেন, হাসপাতালে দিতে হবে কেন? এখানে ওর চিকিৎসা হতে পারে না? কী যে হয়েছে ছেলেটার, সেটাই তো আপনারা এখনও ধরতে পারলেন না?"

স্থানীয় ডাক্তারটি বললেন, "সত্যিই ধরতে পারছি না। শরীরে কোনো রোগের লক্ষণ নেই, আঘাত কি রক্তপাতের চিহ্নও নেই। কাল সারা দিনই যে সুস্থ ছিল, সে

হঠাৎ অজ্ঞানই বা হয়ে গেল কেন আর এতক্ষণ অজ্ঞান হয়েই বা থাকবে কেন? ব্লাড প্রেসার ঠিক আছে। পাল্স বীট একটু শ্লো, তাও প্রায় স্বাভাবিকই ধরা যায়। সুতরাং এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকার কোনো কারণই বোঝা যাচ্ছে না।"

প্রিয়ব্রত বলল, "ধরুন, কোনো ভারী কিছু জিনিস দিয়ে কেউ যদি ওর মাথায় মারে—"

বড়মামা বললেন, "কে মারবে?"

প্রিয়ব্রত বলল, "সেটা না হয় পরে দেখা যাবে....যদি সেরকম ভাবে কেউ মারে যাতে কাটল না কি রক্ত বেরুল না, কিন্তু ভেতরে আঘাত লাগল—"

স্থানীয় ডাক্তারটি বললেন, "ভারী কোনো জিনিসের আঘাত লাগলে জ্ঞান হারাতে পারে। কিন্তু তাতে তো কেউ এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকে না।"

ডাক্তার সোম বললেন, "আমি পি· জি· -তে আছি। সেখানে ওকে নিয়ে গেলে ভালো ক'রে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।"

স্বপনের ছোটমামা ইন্দ্রবাবু বড়মামাকে বললেন, "দাদা, আমারও মনে হয় হাসপাতালে পাঠানই উচিত। হাসপাতালে নানারকম আধুনিক যন্ত্রপাতির যত সুবিধে পাওয়া যায়—"

বড়মামা ভঙ্গ-পাওয়া মুখে বললেন, "পি· জি· তো অনেক দূরে। এতখানি রাস্তা—"

প্রিয়ব্রত এই সময় চোখের ইসারায় বিমানকে ডেকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিমান তার কাছে যেতেই প্রিয়ব্রত বলল, "চল্, ছাতটা একবার দেখে আসি।"

ছাতের দরজায় খিল দেওয়া। খিল খুলে ওরা ঢুকল ভেতরে। সমান সাইজ করে একটার পর একটা ফুল গাছের টব সাজান। মাঝখানে দাঁড় করানো আছে অনেক প্লাস্টিকের পাইপ। ছাতের ট্যাঙ্ক থেকে ঐ পাইপগুলোতে করে সব টবে জল দেওয়া হয়। দেখে মনে হচ্ছে, আজ সকালে গাছে জল দেওয়া হয় নি।

প্রিয়ব্রত ছাতটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে বলল, "এত বড় ছাতে একটা বল্ হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া সত্যিই খুব শক্ত।"

বিমান এগিয়ে গেল খড়ের ঘরটার দিকে। ভারী সুন্দর ঘরটা। ঠিক মনে হয় গ্রামের একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘর কেউ যেন শহরের এক তিনতলার বাড়ির ছাতের ওপর বসিয়ে দিয়েছে। ঘরটায় রয়েছে একটা টেবিল, দুটো চেয়ার আর একটা ইজিচেয়ার।

টেবিলের ওপরে স্বপনের বইপত্র ছড়ান, একটা বই উল্টে পড়ে আছে মাটিতে। বিমান বইটা তুলে দেখল এভারেস্ট অভিযানের ওপর লেখা একটা ইংরেজি বই। এই বইটা বিমানই স্বপনকে উপহার দিয়েছিল।

টেবিল ল্যাম্পটা তখনও জ্বলছে। কাল রাত্তিরে স্বপনকে এখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখার পর গোলমালের মধ্যে কারুর আর আলোটা নিভিয়ে দেওয়ার কথা মনে পড়ে নি। এ ঘরে ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্নই কিন্তু ছিল না।

এমন সময় প্রিয়ব্রত ঘরে ঢুকে বিমানের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "এই দ্যাখ্।"

প্রিয়ব্রতর হাতে কাদামাখা নোংরা একটা ক্যাম্বিসের বল্।

বিমান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এসেই ওটা খুঁজে পেলে? ওরা সবাই মিলে খুঁজল—"

হাসতে হাসতে প্রিয়ব্রত বলল, "ওদের চেয়ে আমার খোঁজাটা তো একটু অন্যরকম হবেই। হাজার হলেও এক সময় পুলিশে চাকরি করেছি তো!"

"কোথায় পেলে?"

"ব্যাপারটা হয়েছিল কী জানিস্! ওরা টবগুলো সরিয়ে সরিয়ে তার আড়ালে বলটা আছে কি না খুঁজছে। কিন্তু বল্টা ছিল একটা টবের মাটিতে আধখানা গাঁথা অবস্থায়। ফলে মাটির রং আর বল্টার রং তো প্রায় একই হয়ে গিয়েছিল, তাই ওদের চোখে পড়ে নি। যাক্, একটা জিনিস প্রমাণ হলো যে স্বপন ইচ্ছে করে ওদের বল্টা লুকিয়ে রাখে নি!"

"আমি তো বলেই ছিলুম, স্বপন ও-রকম কাজ কক্ষনও করবে না।"

"বলটা দেখছি বেশ পুরোনো। এইরকম একটা সামান্য বলের জন্যে কেউ রাত্তিরবেলা চুপি চুপি ছাতে উঠে স্বপনের মাথায় ডাণ্ডা মেরে যাবে, এটা বিশ্বাস করা যায় না। তবে একটু অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করেছি। অন্তত চারটে ফুলের টব কাৎ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। কিন্তু....কেন?"

"পাড়ার ছেলেরা দুপুরে বল্টা খোঁজার জন্যে কয়েকটা টব উল্টে দিয়েছিল, তুমিই তো বলেছ।"

"এই তো তোদের দোষ, বিমান! তোরা যুক্তি অনুসরণ না করেই মতামত দিয়ে ফেলিস। ছেলেরা দুপুরবেলা টব উল্টে দিতে পারে, কিন্তু তারপরও তো স্বপন বহুক্ষণ ছাতে ছিল। স্বপন ফুলগাছ ভালোবাসে। তার পক্ষে কি স্বাভাবিক ছিল না, টবগুলো আবার সোজা করে দেওয়া? কাৎ হয়ে পড়ার জন্যে অন্তত দুটো ফুলগাছের বেশ ক্ষতি হয়েছে দেখলুম!"

তা-ও তো ঠিক। স্বপনের একটা অদ্ভুত অভ্যেস আছে। মামার বাড়িতে ও যখনই এসে থাকে, প্রত্যেকদিন খুব ভোরে আর বিকেলবেলা ও প্রত্যেকটা ফুলগাছের গায়ে হাত বুলোয়। ওর ধারণা, গাছেদের আদর করলে গাছরা তা টের পায়। তারা খুশি হয়!

আর ধারণাটা বিশেষ ভুলও নয়। আজকাল অনেক বৈজ্ঞানিকও এই কথা বলেন। গাছেদের শুধু যে প্রাণ আছে তা নয়, তাদের অনুভূতিও আছে। একজন কেউ অকারণে গাছের পাতা ছেঁড়ে, আর একজন গাছকে আদর করে—এই দু'ধরনের লোকেদের গাছেরা চিনে রাখে।

বিমান কিছুক্ষণ এইসব ভেবে প্রিয়ব্রতকে বলল, "তার মানে তুমি বলতে চাও, স্বপন অজ্ঞান হয়ে যাবার পর এই টবগুলো কেউ উল্টে দিয়েছে?"

"সেটা ভেবে দেখতে হবে।"

এই সময় নীচ থেকে ওদের ডাক পড়ল। স্বপনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই

ঠিক হয়েছে। একবার কথা হয়েছিল, অ্যামবুলেন্স ডাকা হবে। কিন্তু তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে বলে এখন ডক্টর সোমের গাড়িতেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্বপনকে।

ধরাধরি করে একতলায় নামান হলো স্বপনকে। এই সময় স্বপনের মা কাঁদতে শুরু করে দিলেন। এতক্ষণ কেউ কাঁদেনি, এই প্রথম কান্না। স্বপনের মাকে কাঁদতে দেখে বড়মামারও চোখে জল এসে গেল।

স্বপনের বাবা কিন্তু বেশ শক্ত আছেন। ডক্টর সোমের গাড়ির পেছনের সীটে শুইয়ে দেওয়া হলো স্বপনকে। ওর বাবা বললেন, "বিমান, তুই ওর মাথাটা কোলে নিয়ে বোস্, আমি সামনে বসছি।"

আগে আগে চলল প্রিয়ব্রতর জিপ, তারপর ডক্টর সোমের গাড়ি। মোড়ের চায়ের দোকানটার কাছে এসে প্রিয়ব্রত ছেলেদের দলটার দিকে বল্‌টা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "এই যে! একটা টবে গেঁথে ছিল।"

স্বপনের মাথাটা কোলে নিয়ে বসে থাকা অবস্থায় বিমানের বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। স্বপন অজ্ঞান হয়ে আছে, কোনো কথা বলছে না, এরকম অবস্থায় স্বপনকে সে কখনও দেখে নি। স্বপনের যদি আর জ্ঞান না ফেরে!

গাড়ি অনেকটা চলে এসে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে যখন যাচ্ছে, তখন স্বপন চোখ মেলল। অবাক চোখে তাকিয়ে বললে, "কে? আমি কোথায়?"

ডক্টর সোম সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা থামিয়ে দিলেন। বিমান বলল, "স্বপন, স্বপন! জ্ঞান ফিরেছে তোর? আমি বিমান।"

স্বপনের বাবা পেছন দিকে ফিরে ব্যাকুল ভাবে বলে উঠলেন, "ওরে স্বপন, এই দ্যাখ্ আমি।"

সারা শরীরটা ধনুকের মতন বাঁকিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করে স্বপন হঠাৎ অদ্ভুত বিকৃত গলায় খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠলো, "ওই! ওই! সবুজ আলো! সবুজ আলো!"

তারপরই আবার ধপ্ করে পড়ে গেল বিমানের কোলে। আবার সে অজ্ঞান।

পি. জি.-তে স্বপনের জ্ঞান ফিরল দু'দিন পরে। প্রথম চোখ মেলেই সে ডেকে উঠল, "মা!"

হাসপাতালের ডাক্তাররা এই দু'দিন হাজার চেষ্টা করেও তার অসুখ যে কী তা ধরতে পারেন নি। অনেক রকম ওষুধ দিয়েও কোনো কাজ হয় নি।

স্বপনের মা সেই সময় হাসপাতালেই ছিলেন। স্বপনের জ্ঞান ফিরেছে শুনে তিনি ছুটে এসে ঢুকলেন কেবিনের মধ্যে। স্বপনের হাত ধরে বললেন, "কী রে, খোকা! ওঃ, আমি যে ঠাকুরকে কত ডাকছিলুম তোর জন্যে—"

স্বপন উঠে বসে জিজ্ঞেস করল, "মা, আমি হাসপাতালে কেন?"

পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন নার্স। মা কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, "উঠো না, উঠো না, তোমার শরীর এখনও দুর্বল!"

স্বপন খাট থেকে নেমে বলল, "দুর্বল! কই, আমি তো একটুও দুর্বল নই। আমার

চশমাটা কোথায়?"

বিমান আর প্রিয়ব্রত বসে ছিল হাসপাতালের মাঠে। খবর পেয়ে তারা ভেতরে আসবার আগেই স্বপন বেরিয়ে এল বাইরে। তার পেছন পেছন ছুটে এল হাসপাতালের কয়েকজন আর্দালি আর নার্স।

স্বপন বাইরে এসেই বলল, "বিমান তুই? প্রিয়দা তুমি? ব্যাপার কী! আমাকে এরা হাসপাতালে আটকে রেখেছে কেন?"

স্বপনকে এরকম সুস্থ অবস্থায় হঠাৎ বেরিয়ে আসতে দেখে বিমান এমনই খুশিতে অভিভূত হয়ে গেল যে কোনো কথাই বলতে পারল না। শুধু বলল, "তুই....তুই....

প্রিয়ব্রত বলল, "উঃ, কী চিন্তাতেই ফেলেছিলি আমাদের! আমরা ভাবলুম তুই বুঝি এবার মরেই গেলি।"

স্বপন বলল, "কেন, আমার কী হয়েছিল?"

প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করল, "কিচ্ছু মনে নেই তোর?"

স্বপন বলল, "কী মনে থাকবে? আমি....আমি তো দক্ষিণেশ্বরে মামার বাড়ি গিয়েছিলুম....তারপর....রাত্তিরবেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলুম ছাতে....সেখান থেকে হাসপাতালে এলুম কি করে?"

একজন নার্স একজন ডাক্তারকেও ডেকে এনেছেন এর মধ্যে। তিনি এসে বললেন, "এই যে স্বপন, তুমি তো দেখছি ভালো হয়ে গেছ। বাঃ, ফাইন! একবারটি ভেতরে এস, তোমাকে একটু চেক্‌আপ করে নিই।"

স্বপন আর কিছুতেই হাসপাতালের মধ্যে ঢুকতে চায় না। সে বলল, হাসপাতাল জায়গাটাই তার বিচ্ছিরি লাগে। এখানে কি রকম একটা গন্ধ থাকে, সেটা তার মোটেই সহ্য হয় না!

প্রিয়ব্রত আর বিমান অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে নিয়ে গেল ভেতরে। তারপর ওকে শুইয়ে দেওয়া হলো একটা উঁচু মতন খাটে। দু'জন ডাক্তার নানারকম করে ওকে পরীক্ষা করে দেখলেন। তাঁরা সব দেখে শুনে বললেন, "স্ট্রেঞ্জ, ভেরি স্ট্রেঞ্জ; ওর শরীরে এখন তো কোনো রকম রোগের লক্ষণই নেই। সম্পূর্ণ সুস্থ ছেলে, অথচ প্রায় তিনদিন অজ্ঞান হয়ে রইলো!"

শুয়ে থাকা অবস্থাতেই স্বপন বলল, "আমি তিন দিন অজ্ঞান হয়ে ছিলুম! না, না, হতেই পারে না!"

একটু বাদেই ডাক্তাররা স্বপনকে ছেড়ে দিলেন, তাকে এখন আর হাসপাতালে আটকে রাখার কোনো মানেই হয় না।

বাইরে এসে ওরা উঠল প্রিয়ব্রতর লাল রঙের জিপ গাড়িটায়।

স্বপন বিমানকে জিজ্ঞেস করল, "আমার সত্যিই কী হয়েছিল বল তো।"

বিমান বলল, "বাঃ, সেটা তো তুই-ই আমাদের বলবি!"

স্বপন বলল, "আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না। শুধু মনে পড়ছে মামার বাড়ির ছাতের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।"

প্রিয়ব্রত বলল, "তোর মাথায় কি কেউ মেরেছিল হঠাৎ?"

স্বপন বললো, "না, তো। আমায় আবার কে মারবে? কেনই বা মারবে?"

প্রিয়ব্রত বলল, "সেদিন দুপুরে ও-পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে তোর ঝগড়া হয়েছিল; ছোট এককড়ি বলে একটা ছেলে তোকে মারবে বলে শাসিয়েছিল, সে কথা মনে আছে?"

স্বপন বলল, "হ্যাঁ, আছে, সে তো একটা বলের ব্যাপারে---না, না, সে ছেলেটা ছাতে উঠে আমায় মারবে কী করে?"

প্রিয়ব্রত বলল, "সে-ই তো সমস্যা! কেউ মারল না, তবু তুই অজ্ঞান হলি কী করে?"

বিমান বলল, "প্রিয়দা, তোমাকে তো আমরা রহস্যভেদী বলি। এই রহস্যের তুমি সমাধান করতে পার না? কিছু একটা হয়েছিল নিশ্চয়।"

প্রিয়ব্রত বলল, "আমি কাল স্বপনের মামার বাড়ি ঘুরে এসেছি একবার। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।"

পরের দিন থেকে স্বপন কলেজে যাওয়া শুরু করল। তার সব কিছুই আবার আগের মতন স্বাভাবিক। শুধু মাঝখানে ঐ তিনদিন সে অজ্ঞান হয়ে ছিল। স্বপনকে অনেকে মিলে জেরা করেও কিছু ফল হয় নি। সে কেন অজ্ঞান হয়ে ছিল, সে সম্পর্কে তার নিজেরই কোনো ধারণা নেই। ব্যাপারটা একটা ধাঁধাই রয়ে গেল।

দিন সাতেক পরে একদিন প্রিয়ব্রত হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলো বিমানের বাড়িতে। সেদিন ওদের কলেজের ছুটি ছিল। ছাতের ওপর একটা ছোট ঘরে বিমান পড়াশুনো করে। প্রিয়ব্রত সেখানে উঠে এসে বলল, "কী রে বিমান, পড়ছিস?"

বিমান বলল, "আর বলো কেন প্রিয়দা? আজ ছুটি, কালই আবার ফিজিক্স অনার্স-এর পরীক্ষা নেবে বলেছে।"

প্রিয়ব্রত হঠাৎ বলল, "হ্যাঁ রে, আজকের খবরের কাগজ পড়েছিস?"

হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে বিমান একটু অবাক হয়ে বলল, "হ্যাঁ, পড়েছি তো। কেন?"

—তোর খট্‌কা লাগে নি? খবরটা দেখেছিস?

—কিসের জন্যে খট্‌কা লাগবে? তুমি কোন্ খবরটার কথা বলছ?

—এই তো তোদের দোষ। ভালো করে খবরের কাগজটাও পড়িস না। আমি রোজ সকালে উঠে তিনখানা কাগজ তন্ন তন্ন করে পড়ি!

—তোমাকে তো আর কলেজের পড়াশুনো করতে হয় না, প্রিয়দা।

প্রিয়ব্রত পকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা খবরের কাগজের পাতা বার করে সেটা ছড়িয়ে ধরল। তারপর বলল, "এই যে তোর জন্যে নিয়ে এসেছি। এই জায়গাটা পড়ে দ্যাখ্।"

একটা ছোট্ট খবরের চারদিকে লাল পেন্সিলের দাগ। মফঃস্বলের সংবাদদাতার খবর। ওপরে লেখা আছে—

"বালকের অদ্ভুত ব্যাধি"

তার নীচের খবরটা এই: *মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে এক আদিবাসী বালকের অদ্ভুত একটা অসুখ হয়েছে। একদিন সন্ধ্যেবেলা সে একটু বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিল, তারপর সারা রাত তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। পরের দিন সকালবেলা দেখা গেল, সে একটা মাঠের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই, নিশ্বাস-প্রশ্বাসও স্বাভাবিক। তবু অনেক চেষ্টা করেও তার জ্ঞান ফেরান যায় নি। গ্রামের মানুষ সবাই ভূতপ্রেতে দারুণ বিশ্বাসী। ছেলেটির বাড়ির লোকেরা প্রথমে ভেবেছিল, রাত্তিরে ছেলেটাকে বোধ হয় ভূতে পেয়েছে। রোজা, ঝাড় ফুঁক সব চলল, কিন্তু কিছুতেই জ্ঞান ফিরছে না দেখে পরে তারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে সে দু'দিন ধরে অজ্ঞান হয়ে আছে, ডাক্তাররাও কিছুই করতে পারছেন না। তবে মাঝে মাঝে সে হঠাৎ বিছানায় উঠে ব'সে "সবুজ বাত্তি", "সবুজ বাত্তি", বলে চিৎকার ক'রে ওঠে, তারপরই আবার ধপ করে বিছানায় পড়ে যায়। ছেলেটিকে দেখবার জন্যে হাসপাতালে বহু লোক ভিড় করে আসছে।*

খবরটা পড়ার পর বিমান প্রিয়ব্রতর চোখের দিকে তাকাল।

প্রিয়ব্রত বলল, "এবার বুঝলি? এখানেও সবুজ আলো!"

বিমান বলল, "স্বপনও সবুজ আলো বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল, আর অত দূরে ঝাড়গ্রামে একটা ছেলে ঠিক একই ভাবে একই কথা বলছে! খুবই আশ্চর্য মিল

তো!"

—নিশ্চয়ই! শোন্ আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। চল্, ঝাড়গ্রাম ঘুরে আসি।

—কবে?

—আজই। আজ তো তোদের ছুটি। আমার জিপে ঝাড়গ্রামে যেতে ঘণ্টা চারেকের বেশি লাগবে না। চল্, ছেলেটাকে দেখে আসি।

—কালকের মধ্যে ফিরতে পারব?

—কেন পারব না? নে, চট্‌পট তৈরি হয়ে নে?

—প্রিয়দা, তুমি বাবার কাছ থেকে পারমিশানটা নিয়ে নাও। কাল আবার পরীক্ষার ব্যাপারটা আছে তো।

—সে তোকে ভাবতে হবে না, আমি ম্যানেজ করছি। তুই তাড়াতাড়ি কর।

—প্রিয়দা, স্বপনকে সঙ্গে নেবে না?

প্রিয়ব্রত ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করতে লাগল।

বিমান বলল, "এক কাজ করা যাক না। স্বপনকে আসল ব্যাপারটা কিছু বলবার দরকার নেই। ওকে বলব, চল্, আজ ঝাড়গ্রাম থেকে বেড়িয়ে আসি।"

প্রিয়ব্রত বলল, "স্বপনকে না নিলে হয় না?"

—কিন্তু স্বপন যখন শুনবে তোমাতে আমাতে জিপে করে ঝাড়গ্রাম বেড়াতে গেছি, তখন ও কি ভাববে বলো তো? আমরা ওকে বাদ দিয়ে কখনও কোথাও গেছি?

—আর তো কিছু নয়, আমার শুধু ভয় হচ্ছে, স্বপন যদি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে?

—না, না। ও খুব ভালো আছে। কাল ও তো কলেজে চমৎকার ব্যাডমিন্টন খেলল।

—তা হলে চল্, স্বপনকে ডেকে নেওয়া যাক্।

হঠাৎ ঝাড়গ্রাম যাবার প্রস্তাব শুনে স্বপন বেশ অবাক হলো। খবরের কাগজের ছোট্ট খবরটা ও পড়ে নি। ওকে কিছু জানানও হলো না। বাইরে বেড়াতে যাবার ব্যাপারে স্বপনের চিরদিনই খুব উৎসাহ। ও আধ ঘণ্টার মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল।

স্বপন উঠে বসতেই প্রিয়ব্রত গাড়িটায় স্টার্ট দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতা ছাড়িয়ে বালি ব্রীজের দিকে ছুটে চলল প্রিয়ব্রতর লাল জিপ। বালি ব্রীজের কাছেই দক্ষিণেশ্বরে স্বপনের মামার বাড়ি। সেখানেই ঘটেছিল দুর্ঘটনাটা।

ব্রীজের ওপর উঠে বিমান হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, "আচ্ছা স্বপন, তুই কখনও খুব তীব্র সবুজ আলো দেখছিস?"

স্বপন অবাক হয়ে বলল, "সবুজ আলো? কিসের সবুজ আলো?"

বিমান বলল, "না, মানে বলছি যে খুব জোরালো সবুজ আলো হঠাৎ কখনও তোর চোখে পড়েছিল?"

স্বপন বলল, "হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?"

বিমান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, প্রিয়ব্রতর দিকে তাকিয়েই থেমে গেল। দেখল প্রিয়ব্রতর ওর দিকে কটমট করে চেয়ে আছে। যেন চোখ দিয়ে বলতে চায়, বিমানের এই প্রসঙ্গটা এখন তোলা উচিত হয় নি।

কথাটা ঘোরাবার জন্যে প্রিয়ব্রত বলল, "বিমানটার মাথায় যেন গোবর ভরা। সবুজ আলো তো সবাই দেখেছে। রেল লাইনের পাশে গ্রীন সিগ্‌ন্যাল দেখা যায় না! দূর থেকে জ্বলজ্বল করে।"

প্রিয়ব্রতর কাছে ধমক খেয়ে বিমান আর মুখ খুলল না। স্বপনও বসে রইল চুপ চাপ করে। ব্রীজ পেরিয়ে ওরা চলল দিল্লি রোড দিয়ে। খানিক দূর গিয়ে বাঁ দিকে আর একটা ব্রীজ পেরিয়ে পাওয়া গেল বম্বে রোড। এই রাস্তা দিয়েই ঝাড়গ্রাম যাওয়া যাবে।

চা খাওয়ার জন্য ওরা থামল কোলাঘাটে।

স্বপন বলল, "প্রিয়দা, তুমি কিন্তু বড্ড জোরে চালাচ্ছ।"

প্রিয়ব্রত বলল, "এই জিপটা নিয়ে বিশ্বভ্রমণে যাব কি না, তাই একটু প্র্যাকটিস করে নিচ্ছি!"

বিমান বলল, "কবে বিশ্বভ্রমণে যাবে, প্রিয়দা? তুমি তো অনেক দিন থেকেই বলছ। এবার দিন ঠিক করো, আমরা তৈরি হয়ে নিই।"

—তোরাও যাবি নাকি?

—নিশ্চয়ই।

—তা হলে চল্, এই শীতেই বেরিয়ে পড়ি!

স্বপন জিজ্ঞেস করল, "প্রিয়দা, গ্রীসে যাবে তো? ওঃ, গ্রীস—গ্রীস—আমার স্বপ্নের দেশ। যতবার ইতিহাস পড়ি, ততবারই আমার মনে হয়, একদিন না একদিন গ্রীসে যাবই।"

প্রিয়ব্রত হেসে বলল, "ঠিক আছে, তোকে আমরা গ্রীসেই রেখে দিয়ে আসব!"

কোলাঘাট থেকে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল ঝাড়গ্রাম। কিন্তু প্রথমেই তো আর হাসপাতালে যাওয়া যায় না, তাহলে স্বপন সন্দেহ করবে। কলকাতা থেকে এত দূরে এসেই কি আর কেউ একটা হাসপাতাল দেখতে যায়!

ডাকবাংলোয় একটা ঘর বুক করল প্রিয়ব্রত। লাল মাটি আর শাল গাছের ঠাস বুনুনির মাঝে ঝাড়গ্রাম শহরটা। ছোট্ট হলেও বেশ সুন্দর। তাছাড়া স্বাস্থ্যকর শহর বলেও এর খ্যাতি দেশজোড়া। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামায় জায়গাটা যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠল।

স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে ওরা ভাত খেয়ে নিল আগে। তারপর প্রিয়ব্রত বলল, "বিমান, তুই স্বপনকে নিয়ে ডাকবাংলোতে গিয়ে বিশ্রাম কর, আমি একটু ঘুরে আসছি। আমার একজন চেনা লোক আছে এখানে, তার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।"

বিমান বুঝতে পারল যে প্রিয়ব্রত এই ছুতোয় হাসপাতালটা একবার ঘুরে দেখে আসতে যাচ্ছে। যে-কোনো কারণেই হোক সেখানে এখনই স্বপনকে নিয়ে যেতে চায় না প্রিয়ব্রত।

প্রিয়ব্রত অবশ্য একেবারে মিথ্যে কথাও বলে নি। এখানে সত্যিই তার চেনা লোক আছে একজন। এখানকার ডি· এফ· ও· অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসার সুকোমল রায় ওর কলেজ জীবনের বন্ধু।

প্রিয়ব্রত চলে যাবার পর বিমান আর স্বপন ডাকবাংলোর বারান্দায় দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

চোখ থেকে চশমাটা খুলে স্বপন বলল, "প্রিয়দা যার সঙ্গে দেখা করতে গেল, দেখে নিস তার সঙ্গে আজ দেখা হবে না।"

বিমান চমকে উঠে বলল, "তার মানে তুই জানিস প্রিয়দা কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে?"

—না, তা জানি না।

—তা হলে কী করে বুঝলি দেখা হবে না?

—আমার মাঝে মাঝে এই রকম মনে হয়। প্রিয়দা ফিরে এলে দেখিস তুই, আমার কথা মেলে কি না! ঝাড়গ্রাম জায়গাটা বেশ সুন্দর তাই না রে, বিমান! এখানে কটা দিন থেকে গেলে হয় না?

—কাল কলেজ খোলা আছে ভুলে গেছিস? আমার আবার একটা ক্লাস টেস্ট রয়েছে।

—তা বলে আজ এসে আজই ফিরে যাব?

—প্রিয়দা বলেছে, সন্ধ্যের পর রওনা হলে আমরা মাঝরাতের মধ্যে ফিরে যেতে পারি কলকাতায়।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর চেয়ারেই হেলান দিয়ে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল স্বপন। বিমান উঠে পায়চারি করতে লাগল বাংলোর বাগানে।

একটু পরেই ফিরে এল প্রিয়ব্রত। বাংলোর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকল বিমানকে। বিমান কাছে যেতেই সে জিজ্ঞেস করল, —"স্বপন কোথায় রে?"

—ঘুমোচ্ছে।

—ভালোই হলো। ততক্ষণে কয়েকটা জরুরি কথা সেরে নিই। হাসপাতালে সেই ছেলেটার সঙ্গে দেখা হলো না রে।

বিমান অমনি একবার চট করে পেছন ফিরে ঘুমন্ত স্বপনের দিকে তাকালো। তারপর বললো, "আশ্চর্য! স্বপন আগে থেকেই সে কথা বুঝলো কি করে! যাই হোক, ছেলেটার সঙ্গে দেখা হলো না কেন!"

—আজকের খবরের কাগজে যে খবরটা বেরিয়েছে, সেটা আসলে পুরোনো খবর। ঘটনাটা ঘটেছে কয়েকদিন আগে! মফঃস্বলের খবর অনেক সময় এরকম দেরিতেই বেরোয়। ইতিমধ্যে ছেলেটা সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি চলে গেছে।

—তা হলে ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না?

—না রে না, আমি ছেলেটার নাম ঠিকানা যোগাড় করে এনেছি। ছেলেটা ঠিক ঝাড়গ্রামের ছেলে নয়। দইজুড়ি নামে একটা গ্রাম আছে এখান থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে, সেখানে থাকে। ওর নাম শম্ভু মাহাতো। এক আদিবাসী চাষীর ছেলে, বছর

দশেক বয়েস।

—এত দূরে এসে ছেলেটার সঙ্গে দেখা করে যাব না?

—দেখা তো করতেই হবে। আজ আর তা হলে কলকাতায় ফেরা হচ্ছে না।

—কিন্তু আমার পরীক্ষার কী হবে?

—আরে ক্লাস টেস্ট তো? এর আগেকার টেস্টগুলো তো ভালোই দিয়েছিস! এটা না দিলেও কোনো ক্ষতি হবে না। আর তোদের আর স্বপনদের বাড়িতে আমি হাসপাতাল থেকেই ফোন করে দিয়েছি। আমার সঙ্গে আছিস, তাই তাঁদের কোনো আপত্তিই নেই।

—তুমি তো দেখছি আগেই আটঘাট বেঁধে নিয়েছ?

—শুধু শুধু কি আর এতদিন পুলিশে কাজ করেছি?

—তা তো বুঝলুম, কিন্তু দইজুড়ি গ্রামে ছেলেটার বাড়িতে আমরা হঠাৎ যাব, তারা কী ভাববে?

—আমরা বলব আমরা খবরের কাগজের রিপোর্টার। কলকাতা থেকে এসেছি ঐ ছেলেটার রহস্যময় অসুখের ব্যাপারটা জানবার জন্যে।

—স্বপনকেও সব খুলে বলতে হয় তা হলে?

—এক্ষুণি জানাবার দরকার নেই। বীজপুর নামে এদিকে আর একটা সুন্দর জায়গা আছে, সেখানে একটা ভালো বাংলোও আছে। আজ রাতটা আমরা সেখানেই কাটাব। বীজপুর যাবার পথেই পড়বে দইজড়ি গ্রাম। সেখান থেকে আমরা ছেলেটার সঙ্গে দেখা করতে যাব।

—সেটাই ভালো হবে।

—তুই এখন স্বপনকে ডেকে জিনিসপত্তর গুছিয়ে নে। আমি আমার বন্ধু ডি. এফ. ও'র সঙ্গে দেখা করে বীজপুরের বাংলোটা রিজার্ভ করে আসছি।

প্রিয়ব্রত আবার চলে যেতেই বিমান এসে স্বপনকে ডাকল।

স্বপন চোখ মেলে বলল, "যাঃ, কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলি তো! একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলুম—"

বিমান বলল, "তোর নামই তো স্বপন। নিশ্চয়ই তুই রোজই ঝুড়ি ঝুড়ি স্বপ্ন দেখিস! তাই না? একেই বলে সার্থকনামা! হ্যাঁ, শোন্, তোর ইচ্ছেই পূর্ণ হলো।"

—তার মানে?

— আজ আর আমাদের ফেরা হচ্ছে না। আজ রাতটা থেকে যেতে হচ্ছে।

—হুররে! চমৎকার! কিন্তু থেকে যেতে হচ্ছে কেন?

—প্রিয়দার কী একটা কাজ আছে এখানে। আজ হলো না। কাল সকালে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আজ রাত্তিরে আমরা থাকব এর চেয়েও ভালো জায়গায়। আরো খানিকটা দূরে বীজপুর বলে একটা জায়গায় এর চেয়েও নাকি অনেক সুন্দর একটা বাংলো আছে।

—দারুণ ব্যাপার তো! আজ রাত্তিরে আমি ঐ বাংলোতে মাংস রান্না করব।

—তাহলেই হয়েছে আর কি! সে মাংস আর কাউকে খেতে হবে না! শিমুলতলায় গিয়ে সেই যে সেবারে তুই মুরগি রেঁধেছিলি? উঃ, কী নুনেপোড়া, কী নুনেপোড়া!

—কিন্তু সেবারে আমার রান্না আলু ভাজাটা তো ভালো হয়েছিল। বল, ভালো হয় নি?

—হ্যাঁ ভালো হয়েছিল, খুব ভালো হয়েছিল। এখন নে, চটপট আমাদের জিনিসগুলো গুছিয়ে নিতে হবে। প্রিয়দা'র ক্যামেরাটা কোথায়? বিকেলে আমি রাস্তায় ছবি তুলব।

—প্রিয়দা যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, তার সঙ্গে দেখা হয় নি নিশ্চয়ই?

—তুই আগে থেকে এসব বলিস কী করে রে? তুই কি জ্যোতিষ জানিস নাকি?

—হাঃ হাঃ, বাবা! কায়দা আছে, কায়দা।

প্রিয়ব্রত ফিরে এসে বলল—আমরা বীজপুরে না গিয়ে কাঁকড়াঝোড়েও যেতে পারি। সেটা আরও দূরে, একবারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে!

স্বপন বলল—তা হলে সেখানেই চল। জঙ্গলের মধ্যে রাত্তিরে খুব ভালো লাগবে। সেখানে বাঘ আছে?

প্রিয়ব্রত বলল—বাঘ আছে কি না জানি না, তবে হাতি আছে। দু'তিনটে হাতি নাকি কয়েকদিন ধ'রে খুব উৎপাত করছে। সে কথা শুনে আরও বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠল বিমান আর স্বপন দু'জনেই। ওরা কেউই আগে বুনো হাতি দেখে নি।

ঝাড়গ্রাম ছাড়িয়ে খানিক দূরে যেতেই রাস্তার পাশে মাইলপোস্টে দেখা গেল দইজুড়ির নাম। আর মাত্র দু' মাইল দূরে। সেখানে গিয়ে শম্ভু মাহাতো নামের ছেলেটার বাড়ি খুঁজে বার করতে হবে। নিশ্চয়ই তাতে কোনো অসুবিধে হবে না। খবরের কাগজে যখন ওর কথা বেরিয়েছে তখন ছেলেটা নিশ্চয়ই বিখ্যাত হয়ে গেছে। এখন শম্ভু মাহাতোর নাম বললেই ওখানে সবাই চিনবে।

কিন্তু দইজুড়িতে গিয়ে শম্ভু মাহাতোর বাড়ি খুজতে হলো না ওদের। তার আগেই একটা দারুণ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল।

দইজুড়িতে একটা তিন মাথার মোড় আছে। জিপটা তখন সেখানে পৌঁছোয় নি, দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটছে চার পাঁচটা ছেলে। হঠাৎ তাদের দেখে স্বপন চিৎকার করে উঠল, "থামো, থামো, প্রিয়দা, শিগ্‌গির গাড়িটা থামাও।"

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করল, "কী রে, কী ব্যাপার!"

একটা ছেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে স্বপন বললো, "কী আশ্চর্য! আজ দুপুরেই তো আমি এই ছেলেটাকে স্বপ্নে দেখেছি।"

কথাটা বলতে বলতেই জিপ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল স্বপন।

তারপর দুটো হাত তুলে স্বপন চিৎকার করে উঠল, "সবুজ আলো, সবুজ আলো।"

ছেলেদের দলের মধ্যে বছর দশেক বয়েসের একটা ছেলেও ঠিক ঐ রকম ভাবেই

দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "সবুজ বাত্তি! সবুজ বাত্তি!"

স্বপন দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ছেলেটিকে। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই অজ্ঞান হয়ে ধপাস্ করে পড়ে গেল মাটিতে।

প্রিয়ব্রত আর বিমান অবাক হবারও সময় পেল না। তক্ষুনি ওদের তোলা হলো জিপে। প্রিয়ব্রত ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে চলে এল ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে।

ডাক্তাররা হাজার চেষ্টা করেও পুরো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওদের দু'জনের জ্ঞান ফেরাতে পারলেন না। কোনো কিছু খাওয়াবারও উপায় নেই। পাশাপাশি দুটো খাটে ওরা শুয়ে রইল নিথর হয়ে। সামান্য একটু নিশ্বাস পড়ছে। এ ছাড়া বেঁচে থাকার কোনো চিহ্নই নেই।

বিমান আর প্রিয়ব্রত রাতটা কাটাল ডাক বাংলোয়। স্বপনের বাড়িতে খবরটা দেওয়া উচিত। কিন্তু অনেক বার চেষ্টা করেও টেলিফোনের লাইন পাওয়া গেল না কলকাতার। প্রিয়ব্রত আর বিমান প্রায় সারা রাত জেগেই কাটাল। দু'জনেই হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।

স্বপন এর আগে কখনও ঝাড়গ্রামে আসে নি। ঐ সাঁওতাল ছেলেটিকে তার চেনবার কোনো কারণই নেই। আর সাঁওতাল ছেলেটিই বা চিনবে কী করে স্বপনকে? তবু দু'জনে দু'জনকে দেখা মাত্র ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল। আর দু'জনেই চেঁচিয়ে উঠল 'সবুজ আলো' বলে!

কোথায় কলকাতা আর কোথায় ঝাড়গ্রাম! এই দু'জায়গার দু'জন অচেনা ছেলে পরস্পরকে দেখে হঠাৎ 'সবুজ আলো' বলে চিৎকার করে উঠবেই বা কেন?

একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিমান জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা প্রিয়দা, এটা ঐ যে কী বলে জাতিস্মর-টাতিস্মরের ব্যাপার নয় তো।"

প্রিয়ব্রত বলল, "ধুৎ! আমি ওসব মানি না।"

বিমান বলল, "আমি কিন্তু শুনেছি, আগের জন্মের কথা অনেকের নাকি মনে থাকে। সত্যজিৎ রায়ের 'সোনার কেল্লা' বইটাতে যেরকমটা আছে....."

প্রিয়ব্রত বলল, "তুই বলতে চাস, দু'জনেরই এক সঙ্গে আগের জন্মের কথা মনে পড়েছে?"

—তা ছাড়া আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে?

—তা হলে ঐ 'সবুজ আলো'র ব্যাপারটা কী? আগের জন্মের আর কিছু মনে পড়ল না, শুধু ঐ সবুজ আলোর কথাই মনে পড়ল! এ হতেই পারে না। নিশ্চয়ই এর অন্য ব্যাখ্যা আছে।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ওরা আবার ছুটল হাসপাতালে ছেলে দুটোর খবর নিতে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারল তখনও সেই একই অবস্থা।

তখুনি ওরা ঠিক করল, আর ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। আজই স্বপনকে কলকাতায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা দরকার। আর ঐ সাঁওতাল ছেলেটির বাড়ির

লোকজন যদি রাজি হয় তাহলে ওকেও চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে।

কাছেই রেল স্টেশন। ওরা হাঁটতে হাঁটতে চলে এল প্ল্যাটফর্মে। দু'জনে দু' ভাঁড় চা নিল। সাতটার পর একটা ট্রেন আসবে জামসেদপুর থেকে। সেই ট্রেনে কলকাতায় খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছোনো যায়। কিন্তু প্রিয়ব্রতর জিপটার তা হলে কী হবে? এই নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করল দু'জনে। তারপর ঠিক হলো জিপে করেই সকলে মিলে ফেরা হবে।

স্টেশন থেকে বাইরে এসে ওরা জিপে উঠতে যাবে, এমন সময় একজন মাঝবয়েসী ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, এখানে হাসপাতালটা কোথায় বলতে পারেন?"

লোকটি যেমন লম্বা, তেমনি স্বাস্থ্যবান। মাথার চুল কাঁচা পাকা, নাকের নীচে শেয়ালের ল্যাজের মতন মোটা গোঁফ। পরণে একটা সিল্কের শার্ট, খাকি ফুল প্যান্ট আর পায়ে খয়েরি রঙের কাবুলি জুতো।

প্রিয়ব্রত লোকটিকে এক পলক দেখে নিয়ে বলল, "হাসপাতাল এই তো কাছেই। আমরা সেখানেই যাচ্ছি।"

ভদ্রলোক প্রিয়ব্রতর জিপটার দিকে তাকিয়ে বললেন,—এই জিপটা আপনার? আপনি কি পুলিশ নাকি?

প্রিয়ব্রত বিমানের দিকে একবার তাকাল। প্রিয়ব্রত তো সত্যিই কিছুদিন আগেও

পুলিশে চাকরি করতো। তাকে দেখলে কি এখনও তা বোঝা যায়?

সে হাসতে হাসতে বলল, "না। পুলিশ নই। হঠাৎ একথা আপনার মনে হলো কেন?"

—জিপটার এরকম লাল রং দেখে!

—ওঃ, তা-ই! ওটা আমার শখ।

—আপনাদের গাড়িতে আমি যেতে পারি? আপনারা যখন হাসপাতালেই যাচ্ছেন।

—ঠিক আছে, উঠুন।

বিমান সরে গিয়ে জায়গা করে দিল ভদ্রলোককে। প্রিয়ব্রত গাড়িতে স্টার্ট দিল।

ভদ্রলোক গাড়িতে বসেই হঠাৎ সবিনয়ে বললেন, "নমস্কার। আমার নাম চক্রধারী সরখেল। আমি এই কাছেই গালুডিতে থাকি। আপনারা?"

প্রিয়ব্রত তাদের দু'জনের পরিচয় জানিয়ে বলল, "আমরা আসছি কলকাতা থেকে।"

—বেড়াতে এসেছেন, তা এই সকাল বেলাতেই হাসপাতালে যাচ্ছেন কেন?

—আমাদের সঙ্গে আর একজন ছিল, সে হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তা আপনি হাসপাতালে যাচ্ছেন কেন? আপনার চেনা কেউ আছে বুঝি?

—না, মশাই, চেনা-টেনা কেউ নেই। তবে কেন যে যাচ্ছি সে কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। শুনলে আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না কে জানে!

বিমান একটু কুঁকড়ে বসে আছে। লোকটির গায়ে ভীষণ পেঁয়াজের গন্ধ। তাছাড়া এই গরমে সিল্কের জামা পরে আছে বলে গা-টাও কী রকম যেন চটচটে।

চক্রধারী সরখেল আবার বললেন—আমি মশাই ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করি। আমার দু'খানা ট্রাক আছে। এই রাঁচি, জামসেদপুর, চাইবাসা, কলকাতা পর্যন্ত যায়। ড্রাইভার চালায়, আমি নিজেও অনেক সময় চালাই। এক একবার গাড়ি নিয়ে বেরোই, দু'তিন দিন পরে ফিরি।

প্রিয়ব্রত বলল,—আপনার চক্রধারী নামটা দেখছি সার্থক।

—কেন? ও কথা বললেন কেন?

—গাড়ির স্টিয়ারিংটা তো অনেকটা সুদর্শন চক্রের মতনই দেখতে, তাই না? আপনি সেটা ধরে থাকেন......

—বাঃ, বেশ বলেছেন তো! আগে কেউ বলে নি তো একথা। তাহলে আর একটা মজার কথা আছে, শুনবেন? এদিকে চক্রধরপুর বলে একটা জায়গা আছে, জানেন তো? সেখানে আমি গেলেই অনেকে বলে ওঠে, এই যে মালিক আ গিয়া, মালিক আ গিয়া।

ভদ্রলোক নিজেই হেসে উঠলেন হো-হো করে।

প্রিয়ব্রত হঠাৎ জিজ্ঞেস করল —আপনি এত সকালে গালুডি থেকে এলেন কী করে? এখনও তো কোনো ট্রেন আসে নি!

—আমার একটা ট্রাক যাচ্ছিল খড়্গপুরে, ভোর চারটেয় ছেড়েছে। সেটাতেই এসে নেমে পড়লাম এখানে। আমার মেয়ে জোর করে আমায় পাঠাল।

—কেন, গালুডিতে হাসপাতাল নেই?

—আপনি বুঝি ভাবছেন এখানকার হাসপাতালে আমি নিজের চিকিৎসার জন্য এসেছি? না, না, আমি ডাক্তার কবিরাজের কাছে পারতপক্ষে যাই না মশাই। আমার কোনো অসুখই হয় না। একটু কখনও জ্বর টর যদি হয়ও আমি গ্রাহ্য করি না। এখন ব্যাপারটা হয়েছিল কি জানেন? আমি মশাই দিন তিনেক বাড়িতে ছিলাম না, ট্রাক নিয়ে গিয়েছিলাম অলকোবাদ। কোনদিন গেছেন সেখানে? ভারি সুন্দর জায়গা। তা আপনারা তো বেড়াতেই এসেছেন, চলুন না, সেখান থেকে ঘুরে আসবেন একবার।

—না, মশাই আমাদের আজই কলকাতায় ফিরতে হবে।

—আপনাদের সঙ্গে পথে এইভাবে আলাপ হলো, ভেবেছিলাম, আপনাদের গালুডিতেও আমার বাড়িতে একবার নিয়ে যাব।

—এবারে হলো না, পরে যদি আবার আসি যাওয়া যাবে।

জিপটা একটু পরেই পৌঁছে গেল হাসপাতালের সামনে। প্রিয়ব্রত বলল, এসে গেছি, নামুন।

চক্রধারীবাবু বললেন, "এইটে হাসপাতাল? ঝাড়গ্রামের ওপর দিয়ে কতবার গেছি, এসেছি, কোনোদিন খোঁজও করি নি তো!"

প্রিয়ব্রত নেমে পড়েছে, কিন্তু চক্রধারীবাবু নামেন নি বলে বিমানও নামতে পারছে না।

—কী হলো, নামুন!—তাড়া দিল বিমান।

—ও মশাই, আমার যে বড্ড ভয় করছে। আমি যে কোনোদিন হাসপাতালে যাই নি!

প্রিয়ব্রত আর বিমান দু'জনেই দারুণ অবাক। এমন একটা লম্বা চওড়া জোয়ান লোকের মুখখানা সত্যিই ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে গেছে!

প্রিয়ব্রত বলল, "হাসপাতালে ঢুকতে ভয় পান, তা হলে এসেছেন কেন?"

চক্রধারীবাবু বললেন, "আমি কি আর সাধে এসেছি? আমার মেয়ে জোর করে পাঠাল যে। আমার মেয়ের নাম সীতা। সে আমায় উঠতে বসতে শাসন করে।"

—আপনার মেয়ে আপনাকে পাঠিয়েছে কেন? আপনার কি কোনো অসুখ করেছে?

—না, না, বললুম তো, আমার কখনও অসুখ হয় না। আর সে রকম কোনো বড় অসুখ হলে আমি কি আর জামসেদপুরে দেখাতে পারতুম না? এই ঝাড়গ্রামে আসতে হবে আমাকে?

—কী মুস্কিল, তাহলে এলেন কেন?

—দয়া করে আপনি ভাই আমায় একটু সাহায্য করুন। আমার সব কথা শুনলেই আপনি বুঝবেন। একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন?

—আমরা বিশেষ ব্যস্ত, আপনি সংক্ষেপে বলুন।

—হ্যাঁ, তাই বলছি। ঐ যে বললুম, আমি নিজে দুটো ট্রাকের মালিক হলেও প্রায়ই নিজেই ট্রাক চালাই। কখনও কখনও তিন-চার-দিন বাড়ি ফিরি না—

প্রিয়ব্রত একটু চটে গিয়েই বলল,—তা তো আগেই শুনেছি। আসল কথাটা চটপট বলে ফেলুন।

বিমান আরও অধৈর্য হয়ে উঠেছে। এই লোকটাকে তার ভালোও লাগছে না। সে স্বপনের জন্যে খুবই চিন্তিত হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে এখন আবার এই লোকটা এসে ঝামেলা বাধাচ্ছে কেন?

চক্রধারীবাবু বললেন, "আমরা যে কোথায় কখন থাকব, তার ঠিক নেই। অনেক সময় তো রাস্তার ধারে পাঞ্জাবীদের হোটেলে ট্রাক থামিয়ে রাত্তিরটা ঘুমিয়ে নিই ওদের খাটিয়ায় শুয়ে। কখনও কখনও ট্রাকের মধ্যেই ঘুমিয়ে থাকি।"

—বেশ, বুঝলুম সব। এখন আসল কথাটা বলুন।

—আমি খবরের কাগজ টাগজ বিশেষ পড়ি না। পড়ার অভ্যেসও নেই, সময়ও পাই না।

অধৈর্য হয়ে বিমান বলল, "প্রিয়দা, তুমি তা হলে এঁর কাছে গল্প শোনো, আমি ভেতরে গিয়ে স্বপনের খবরটা নিয়ে আসি।"

চক্রধারীবাবু বিমানের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "একটু দাঁড়াও ভাই, তুমিও শোনো। আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কখনও স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠি না। সবাই বলে ঘুমোলে আমার নাকি নাক ডাকে! কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে ভয় পেয়ে কখনও চেঁচিয়ে উঠেছি, এ রকম কথা কেউ বলতে পারবে না।"

প্রিয়ব্রত বেশ রাগত ভাবেই বলল,—"কী মুস্কিল, আমরা কি এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনব?"

—দোহাই, রাগ করবেন না। সবটা শুনলেই আমার অবস্থাটা বুঝতে পারবেন। আমি কি আর আপনাদের মতন গুছিয়ে কথা বলতে পারি! লেখাপড়াও বেশি শিখি নি, আর ট্রাক চালানোর সময় দিনের পর দিন কারুর সঙ্গে কথাই হয় না। আর ঐ যে বললুম, খবরের কাগজ আমি পড়ি না, আমার মেয়ে কিন্তু পড়ে। মেয়ের পড়াশুনোয় খুব মাথা—

—একবার বলছেন ঘুমের কথা, একবার বলছেন খবরের কাগজের কথা। আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

—চারদিন বাড়ি ছিলুম না, কাল রাতে বাড়ি ফিরেছি। অমনি আমার মেয়ে সীতা বললে, বাবা, তুমি কাল ভোরেই ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে চলে যাও।

—কেন? সেটাই তো আমরা জানতে চাইছি।

—খবরের কাগজে নাকি বেরিয়েছে যে এই হাসপাতালে একটা সাঁওতাল ছেলে ভর্তি হয়েছে। সে অজ্ঞান অবস্থায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'সবুজ আলো! সবুজ আলো!' আমার মেয়ে তো বললে এই কথা! মেয়ে তো আর মিথ্যে বলবে না! সে বললে, শিগগির যাও বাবা—

বিমান আর প্রিয়ব্রত পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। এই বাক্যবাগীশ লোকটার মুখেও সবুজ আলোর কথা শুনবে, ওরা আশাই করে নি!

—আপনি সেই ছেলেটি দেখতে এসেছেন?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—সেটা তো আমি নিজেই জানি না! তবে আমার মেয়ে বলছে, মেয়ের মা বলছে, আমি নাকি একদিন ট্রাকের মধ্যে শুয়ে থেকে বারবার 'সবুজ আলো', 'সবুজ

আলো' বলে চেঁচিয়েছি! তারপর বারো চোদ্দ ঘণ্টার মধ্যে কেউ আমায় ঠ্যালাঠেলি করেও নাকি জাগাতে পারে নি! আমার তো বিশ্বাসই হয় না। কিন্তু সবাই বলছে.....।

প্রিয়ব্রত আর বিমান পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। বিমানের শরীরটা ছমছম্ করে উঠল একটু। তার মাথাও গুলিয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই নিয়ে তিনজন হলো!

তিনজন মানুষ 'সবুজ আলো', 'সবুজ আলো' বলে কোনো না কোনো সময় চেঁচিয়ে উঠেছে! অথচ কেউ কাউকে চেনে না। একজন থাকে কলকাতায়, একজন ঝাড়গ্রামে আর একজন গালুডিতে। কেউ কারুকে কোনোদিন চোখে দেখে নি তো বটেই, তিনজনের বয়সেরও অনেক তফাৎ।

চক্রধারী সরখেলের বয়েস অন্তত পঞ্চাশ বছর তো হবেই। ভদ্রলোক ট্রাকের মালিক, নিজেও ট্রাক চালান, বহু জায়গা ঘুরছেন। মুখখানা এখন তো ভয়ে কুঁকড়ে গেছে একেবারে।

চক্রধারী সরখেল অসহায়ের মতন বললেন,—এসব কী ব্যাপার বলুন তো মশাই? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! আমার মেয়ে আমাকে জোর করে পাঠাল এখানে—

প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করল,—আপনি 'সবুজ আলো' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন কেন? আপনি কি কোনো সবুজ আলো দেখেছিলেন?

চক্রধারীবাবু বললেন,—কী জানি মশাই। আমার তো কিছুই মনে নেই। আমি নাকি কুম্ভকর্ণের মতন ভোঁস ভোঁস করে গোটা একটা দিন ঘুমিয়েছি। ব্যাপারটা হয়েছিল কি, অলকোবাদ থেকে ট্রাক চালিয়ে ফিরছিলাম তো? খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বাড়ির একেবারে কাছাকাছি এসে....আর যেন পারি না, রাতও হয়ে গিয়েছিল অনেক। রাস্তার ধারে ট্রাকটা থামিয়ে একটু জিরিয়ে নিতে গেছি, ব্যস, অমনি ঘুম এসে গেল! সেখান থেকে আমার বাড়ি মোটে আর এক মাইল.....

বিমান বলল, "মাত্র এক মাইল দূরে আপনার বাড়ি, তাহলে বাড়ি ফিরেই তো ঘুমোতে পারতেন?"

—ঠিক! কিন্তু কেন যে ঘুমিয়ে পড়লুম কে জানে!

—তারপর?

—সেই ভাবেই রাত কেটে গেল। ও হ্যাঁ, এখন যেন একটু একটু মনে পড়ছে। একটা খুব জোরালো আলো আমার মুখে এসে পড়ায় আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল একবার.....

—সেটা কি সবুজ রঙের আলো?

—তা মনে নেই! কে যে সেই আলো ফেলেছিল তাও মনে করতে পারছি না....মাঝ রাতে অনেক সময় রাস্তায় ডাকাতি হয়। কিন্তু ডাকাত হলে...কিছু নেয় নি তো আমার....কোমরের গেঁজেতে শ' আড়াই টাকা ছিল, তা ঠিক ছিল, হাতে ঘড়ি ছিল, তাও নেয় নি।

—সেই আলোটা চোখে পড়ার পর জেগে উঠে আপনি আর কিছুই দেখতে পেলেন না?

—নিশ্চয়ই আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কিংবা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম, নইলে আর কিছু মনে করতে পারছি না কেন? সকালবেলা আমায় ট্রাকের মধ্যে ঘুমোতে দেখে দু' একজন চেনা লোক আমার বাড়িতে খবর দেয়। তখন আমারই আর একজন ড্রাইভার রামস্বরূপ লোকজন নিয়ে আমায় ডাকতে আসে। কিন্তু অনেক ঠেলাঠেলি করেও তারা নাকি আমার ঘুম ভাঙাতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত রামস্বরূপ ট্রাকটা চালিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসে। কয়েকজন মিলে নাকি আমায় ধরাধরি করে নামিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। আমার মেয়ে তো ভেবেছিল যে আমি মরেই গেছি! একজন ডাক্তারও নাকি ডেকে এনেছিল। সেই ডাক্তার নাড়ি টিপে কিছুই বুঝতে পারে নি। কী সব ওষুধ মোষুধ দিয়েছিল, তাও পেটে যায় নি আমার। সারাদিন ঘুমিয়েছি নাক ডাকিয়ে। মাঝে মাঝে ঐ ঘুমের মধ্যেই নাকি দু'চারবার 'সবুজ আলো', 'সবুজ আলো' বলে চেঁচিয়েছি!

—এখন আপনার শরীর বেশ সুস্থ আছে তো?

—হ্যাঁ। একদম আগেকার মতন।

—তা হলে এই সকালবেলা হাসপাতালে এলেন কেন?

—আমার মেয়ে যে বললে! সে খবরের কাগজে পড়েছে যে একটা সাঁওতাল ছেলে নাকি এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, সেও 'সবুজ আলো' 'সবুজ আলো' বলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। কী ভৌতিক ব্যাপার বলুন দেখি মশাই! কোথায় একটা সাঁওতাল ছেলে আর কোথায় আমি, দু'জনেই ঘুমের মধ্যে একই দুঃস্বপ্ন দেখে ভয়ে এক কথা বলে চ্যাঁচালুম? আর কী যে দুঃস্বপ্ন দেখেছি, তাও মনে করতে পারছি না ছাই!

—আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন, আমাদের এক বন্ধুও কলকাতায় ঐ একই রকম চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল!

—অ্যাঁ? বলেন কী? কলকাতায়?

—হ্যাঁ!

প্রিয়ব্রত বলল,—আপনারা দু'জনে এবার জিপ থেকে নামুন।

চক্রধারীবাবু জিপ থেকে নেমে প্রিয়ব্রতর হাত চেপে ধরে বললেন,—কলকাতায় আপনাদের বন্ধু ঐ একই দুঃস্বপ্ন দেখেছিল, অ্যাঁ? তা আপনারা এই ঝাড়গ্রামে এসেছেন কেন?

—আপনার মেয়ে যে কারণে আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে, সেই একই উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসেছিলাম! ঐ সাঁওতাল ছেলেটিকে দেখবার জন্যেই।

—চলুন তা হলে আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও যাই। ভাগ্যিস আপনাদের সঙ্গে দেখা হলো। আমি মশাই একলা এই হাসপাতালে ঢুকতে পারব না। কথাটা ভাবলেই আমার গা শিউরে উঠছে। চলুন স্যার—

—নাঃ।
—কী বললেন?
—আপনার হাসপাতালের মধ্যে যাওয়া এখন ঠিক হবে না। আপনি বরং বাড়ি ফিরে যান।
—কেন, এ কথা বললেন কেন? আমার মেয়ে যে বললে·····যে ডাক্তার ঐ সাঁওতাল ছেলেটির চিকিৎসে করছে, তাঁর কাছে আমার সব কথা জানাতে। আমার মেয়ের খুবই বুদ্ধি, পড়াশুনোয় ফার্স্ট হয়। সে তো এলেবেলে কথা বলবে না।
—আপনার মেয়ে ঠিকই বলেছে। কিন্তু এর পরের ঘটনাটা তো সে জানে না। ঐ সাঁওতাল ছেলেটিকে আপনি দেখে ফেললে তার ফলও খারাপ হতে পারে!
—ফল খারাপ হবে? তার মানে? একটা ছোট ছেলেকে দেখলে·····
বিমানের মনে পড়ল দইজুড়ি গ্রামের ঘটনাটার কথা। সাঁওতাল ছেলেটিকে দেখা মাত্র স্বপন ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল! তারপর দু'জনেই সবুজ আলো, সবুজ আলো বলতে বলতে অজ্ঞান। চক্রধারী সরখেলের সঙ্গে ওদের দেখা হলেও ঠিক ঐ রকমই হবে কি না কে জানে?
বিমান বলল,—প্রিয়দা, তবু একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত না? এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলেও ওদের একই অবস্থা হয় কি না—
প্রিয়ব্রত বলল,—কিন্তু যদি ওরা আবার অজ্ঞান হয়ে যায়, তাহলে আমাদের আবার একটা দিন এখানে থাকতে হবে। তা ছাড়া বারবার এরকম অজ্ঞান হওয়াও তো ভালো নয় স্বাস্থ্যের পক্ষে।
এই সময় হাসপাতালের গেট দিয়ে একজন ডাক্তারকে বেরিয়ে আসতে দেখে প্রিয়ব্রত এগিয়ে গিয়ে ডাকল,—ডক্টর মৌলিক, একটু দাঁড়াবেন, দয়া করে?
এই ডক্টর মৌলিকের অধীনেই কাল স্বপন আর সাঁওতাল ছেলেটিকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল।
ডক্টর মৌলিককে চক্রধারী সরখেলের ঘটনাটা সংক্ষেপে জানাল প্রিয়ব্রত।
সব শুনে ডক্টর মৌলিক বললেন,—স্ট্রেঞ্জ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ! এরকম কক্ষনো শুনি নি তো! তাহলে তো পুলিশে খবর দেওয়া উচিত, তাই না?
প্রিয়ব্রত বলল, পুলিশ কী করবে? এর মধ্যে তো চুরি ডাকাতি কিংবা মানুষ খুনের কোনো ব্যাপার নেই। যাই হোক, আপনি আপনার রুগীদের কেমন দেখলেন?
—রুগী কোথায়, আজ সকালে ওরা তো সম্পূর্ণ সুস্থ। স্বপন চা খেয়েছে, আর শম্ভু মাহাতো নামে ছেলেটিকে দেওয়া হয়েছে এক গেলাস দুধ। দু'জনকে রাখা হয়েছে দুটি পাশাপাশি বেডে, কিন্তু কেউ যে কাউকে চেনে এমন কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। অথচ, আপনি বললেন, কাল ওরা পরস্পরকে দেখা মাত্রই ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল।
—সত্যিই তাই হয়েছিল। রহস্যটা আমিও বুঝতে পারছি না। যাই হোক, এখন এই চক্রধারীবাবুকে নিয়ে কী করা যায়?

—উনি যদি হাসপাতালে ভর্তি হতে চান, আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি, ওঁর কোনো রোগ আছে কি না।
—উনি বলছেন, উনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আমি চাই না এই ভদ্রলোকের সঙ্গে শম্ভু মাহাতো কিংবা স্বপনের দেখা হোক।
—আমি কিন্তু চাই।
—যদি ওরা তিনজনই আবার অজ্ঞান হয়ে যায়?
—তা হলেও এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটা কী করে ঘটছে, তা আমি নিজের চোখে দেখতে চাই। এক কাজ করুন না, বেশি লোকজনের সামনে এসব ঘটনা না ঘটাই ভালো·····কাছেই আমার কোয়ার্টার্স, সেখানে আসুন। আমার ওখানে চা খাবেন, চক্রধারীবাবু থাকবেন স্বপন আর শম্ভুকেও নিয়ে আসা হবে—
—বারবার অজ্ঞান হলে ক্ষতি হবে না?
—দু'বার তো কোনো ক্ষতি হয় নি দেখা যাচ্ছে। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন, প্রথম বারের চেয়ে দ্বিতীয়বার ওদের জ্ঞান ফিরেছে অনেক তাড়াতাড়ি?
—তা ঠিক।
—তা হলে সেই ব্যবস্থাই করা যাক। ঐ যে—দেখতে পাচ্ছেন তো আমার কোয়ার্টার? আপনারা চক্রধারীবাবুকে নিয়ে ওখানে চলে যান। আমি স্বপন আর শম্ভুকে রিলিজ করে নিয়ে আসছি এক্ষুনি।
ডক্টর মৌলিক আবার ঢুকে গেলেন হাসপাতালে। প্রিয়ব্রত জিপটার কাছে এসে চক্রধারীবাবুকে বলল,—"চলুন!"

চক্রধারীবাবু জিজ্ঞেস করলেন,—"কোথায়?"

—ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টার্সে।উনি আপনাকে চা খাবার নেমন্তন্ন করেছেন। সেখানে আপনার সব কথা ওঁকে খুলে বলবেন।

চক্রধারীবাবু জিভ কেটে বললেন,—"এই যাঃ! আমি তো চা খাই না। ডাক্তারবাবু নেমন্তন্ন করলেন, অথচ আমি যদি চা না খাই, উনি রাগ করবেন না তো?"

—আপনি একদম চা খান না?

—নাঃ! চা খেলে আমার অম্বল হয়। সকালবেলা আমার জিলিপি আর গরম দুধ খাওয়া অভ্যেস। আজ এখনও কিছু খাই নি, খিদেটা বেশ পেয়েছে বটে....স্টেশনের ধারে গরমগরম জিলিপি ভাজছিল তখন দেখেছি, কিনে নিয়ে আসব?

—আবার অত দূরে যাবেন? ডাক্তারবাবু এখুনি এসে পড়বেন বোধহয়।

—কতক্ষণ আর লাগবে? আপনারা গিয়ে বসুন না, আমি না হয় সাইকেল রিক্সা নিয়ে ফিরব, এই যাব আর আসব—

যে কোনো কারণেই হোক, এই চক্রধারী সরখেলকে এখন একা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হলো না প্রিয়ব্রতর। সে একটু চিন্তা করে বলল, "—থাক। জিলিপি দুধ পরে খাবেন। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কাজটা আগে সেরে নেওয়া যাক। আপনি চা না খান, বিস্কুট খান তো? আমাদের জিপে বিস্কুট আর চীজ আছে, না রে বিমান?"

—হ্যাঁ, আছে।

—সেগুলো নামিয়ে নে। জিপটা এখানেই থাক।

ওরা গিয়ে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টার্সের সামনে দাঁড়াতেই হাসপাতাল থেকে একজন আর্দালি এসে বলল, "ডাক্তার সাব আপনাদের ভিতরে বসতে বলেছেন। উনি একটু পরে আসছেন।"

আর্দালি চাবি খুলে দিল। সামনেই একটা বসবার ঘর। একটা টেবিলের চার পাশে সাত আটখানা চেয়ার। দেয়ালে নানান ওষুধ কোম্পানির ক্যালেণ্ডার। এক দেয়ালে একটা ব্যারোমিটার। এই কোয়ার্টার্সে ডক্টর মৌলিক একাই থাকেন মনে হলো।

চক্রধারীবাবু চীজের গন্ধ শুঁকে বললেন,—এতে যে মশাই পচা দুধের গন্ধ! এ আমি খাব না। দিন, ক'খানা বিস্কুটই শুধু খাই।

অন্যমনস্ক ভাবে প্রায় সাত আট খানা বিস্কুট খেয়ে নিয়ে তিনি ঘরের কোণার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন,—ওটা?

প্রিয়ব্রত বলল,—ওটা একটা ওজনের যন্ত্র।

—আমারও তাই মনে হচ্ছিল। তা হলে নিজেকে একটু ওজন করে দেখা যাক। অনেকদিন ওজন নিই নি।

ওজন যন্ত্রটার ওপর উঠে দাঁড়িয়েই তিনি যেন একেবারে আঁতকে উঠলেন। ব্যাকুল ভাবে বললেন, "এ কী! আমার যে একেবারে মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে!'

প্রিয়ব্রত চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল—কী হলো?

—আর মশাই, সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! গত মাসে আমার ওজন ছিল নব্বুই কিলো,

এখন দেখছি মোটে পঁচাত্তর। এক মাসে পনেরো কিলো কমে গেল! এ কি সর্বনেশে কথা!

বিমান হাসতে হাসতে বলল,—তা ওজন কমা তো ভালোই আপনার পক্ষে, এখন আপনার যা চেহারা।

—তা বলে এক মাসে পনেরো কিলো কমবে? এমন কথা কেউ কখন শুনেছে? সেই জন্যই শরীরটা দুর্বল দুর্বল লাগছে কাল থেকে।

—আপনি খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন নাকি?

—মোটেও না। খাওয়া দাওয়াই যদি কম করব, তা হলে আর রোজগার করা কেন? তা হলে টাকা পয়সার কী দরকার? আমার কী হলো বলুন তো? দুঃস্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে ওঠা, তারপর এত ওজন কম....এ রকম আগে কক্ষনও হয় নি!

প্রিয়ব্রত বলল,—আহা, আগেই এত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন? হয়তো এই ওজনের যন্ত্রটা খারাপ, কিংবা এক মাস আগে যেখানে ওজন নিয়েছিলেন সেটা খারাপ ছিল.....

—সেটা অনেক বড় যন্তর....মাল পত্তর চাপাবার জন্যে....

—বুঝেছি। তবু দুটোর যে কোনো একটা খারাপ হতে পারে.... আপনার চেহারা দেখে মোটেই দুর্বল মনে হচ্ছে না।

মুখখানা বেজার করে চক্রধারীবাবু এসে চেয়ারে বসলেন। তারপর বললেন,—স্টেশনের সামনে গরম গরম জিলিপি....কিনে আনলেই হতো। বিস্কুটে কি খিদে মরে? দিন তো আর ক'খানা....

একটু পরেই বাইরে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

প্রথমে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল স্বপন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই সে বলল,—প্রিয়দা, তোমার জিপটা হাসপাতালের সামনে রেখে এসেছ কেন?

ডক্টর মৌলিক শম্ভুর হাত ধরে ছিলেন, তিনি তাকে দরজার সামনে এগিয়ে দিলেন।

শম্ভু আমাদের দেখবার আগেই তার চোখ পড়ল চক্রধারীবাবুর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সে চেঁচিয়ে উঠল,—সবুজ বাত্তি! সবুজ বাত্তি!

স্বপনও চক্রধারীবাবুকে দেখতে পেয়ে একই ভাবে চিৎকার করে উঠল—সবুজ আলো! সবুজ আলো!

তারপর স্বপন আর শম্ভু দু'জনেই চক্রধারীবাবুর দিকে ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে ঐ একই কথা বলতে লাগল ব্যাকুল ভাবে।

চক্রধারীবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিব্রতভাবে বললেন,— আরে, আরে, একী ব্যাপার! চোখ দুটো এমন করছে কেন! পাগল নাকি!

স্বপন আর শম্ভু অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যাবার আগেই প্রিয়ব্রত আর ডক্টর মৌলিক এসে ধরে ফেললেন ওদের।

বিমান অবাক হয়ে চেয়ে রইল চক্রধারীবাবুর দিকে। উনি অজ্ঞানও হন নি, সবুজ

আলো বলে চেঁচিয়েও ওঠেন নি!

সকলেই এমন অবাক হয়ে গিয়েছিল যে বেশ কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলতে পারল না।

তারপর স্বপন আর শম্ভুকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হলো পাশের ঘরে। বিমান উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞেস করল,—ওদের এক্ষুনি আবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত নয় কি?

ডক্টর মৌলিক বললেন,—না, তার দরকার হবে না। কাল থেকে আমি ওদের অবজার্ভ করছি। শুধু অজ্ঞান হয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো কমপ্লিকেশান নেই।

চক্রধারীবাবু ধপ করে বসে পড়ে বললেন,—কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! ছেলে দুটোর মিরগী রোগ আছে নাকি রে বাবা? ঘরে ঢুকেই অজ্ঞান হয়ে গেল? আর আমার দিকেই বা অমন করে ছুটে এল কেন?

প্রিয়ব্রত বলল,—মনে হচ্ছে, ওরা আপনাকে চিনতে পেরেছে!

চক্রধারীবাবু চোখদুটো প্রায় কপালে তুলে বললেন,—আমাকে? ওরা আমাকে চিনবে কী করে? আমি তো জন্মে ওদের কখনও দেখি নি!

—তা হলে ওরা আপনার দিকে ছুটে এল কেন? অচেনা লোকের দিকে কেউ অমন ভাবে ছুটে আসে?

—আমিও তো সেই কথাই জিজ্ঞেস করছি!

—আপনিও ঘুমের ঘোরে সবুজ আলো বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, ওরাও সবুজ আলো সবুজ আলো চিৎকার করেই অজ্ঞান হয়ে গেল। এই দিক থেকেও আপনার সঙ্গে ওদের মিল আছে।

—এই সবুজ আলোর ব্যাপারটাই তো আমি বুঝতে পারছি না মশাই। আলো আবার সবুজ রঙের হয় না কি?

—কেন হবে না? সব রঙেরই আলো হয়। চক্রধারীবাবু, আপনি খুব ভালো করে মনে করে দেখুন তো, আপনি যে বললেন মাঝ রাস্তায় ট্রাক থামিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তারপর চোখে একবার তীব্র আলো পড়ায় জেগে উঠেছিলেন, সেই আলোর রং কি সবুজ ছিল?

—আপনি যখন বলছেন, হতেও পারে।

—হতেও পারে টারে ছাড়ুন। আমি জানতে চাই সেটা সত্যি সত্যি অদ্ভুত ধরনের কোন সবুজ আলো ছিল কি না।

—সেটা আমার ভালো মনে নেই। অনেকটা যেন স্বপ্নের মতন....

এই সময় ডক্টর মৌলিক পাশের ঘর থেকে ফিরে এসে বললেন, ওদের দু'জনেরই চোখের পাতা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। খুব সম্ভব তাড়াতাড়িই জ্ঞান ফিরে আসবে।

বিমান বলল,—ওরা জেগে উঠে চক্রধারীবাবুকে দেখে যদি আবার অজ্ঞান হয়ে যায়?

প্রিয়ব্রত বলল,—না, না, সে ঝুঁকি নেওয়া আর ঠিক হবে না। বারবার এরকম

জ্ঞান হারানো মোটেই ভালো নয়, তাই না ডক্টর মৌলিক?

চক্রধারীবাবু বললেন,—আমি কি তা হলে বাড়ি ফিরে যাব? আমার তা হলে কোনো চিকিৎসার দরকার নেই তো?

ডক্টর মৌলিক বললেন,—আপনার তো কোনো অসুখ নেই, তা হলে আর চিকিৎসা হবে কেন?

চক্রধারীবাবু বললেন,—বাঁচালেন ডাক্তারবাবু, বাড়ি ফিরে গিয়ে আমার মেয়েকে সেই কথাই বলব। কী সব ভুতুরে ব্যাপার রে বাবা! আমি ঘুমের ঘোরে সবুজ আলো বলে চেঁচিয়ে উঠলাম, এখানে দুটো ছেলেও সেই সবুজ আলো, সবুজ আলো বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল!

বিমান বলল,—আপনি কিন্তু অজ্ঞান হন নি!

চক্রধারীবাবু রীতিমতন অবাক হয়ে বললেন,—আমি অজ্ঞান হব কেন? জলজ্যান্ত সুস্থ লোক··· আমার কোনো দিন মাথা ঘোরে না, বুক ধড়ফড় করে না, আমি কেন অজ্ঞান হব?

বিমান বলল,—আমাদের স্বপন যখন ঐ শম্ভু ছেলেটাকে দেখে, তখন ওরা দু'জনেই 'সবুজ আলো' 'সবুজ আলো', করে চেঁচিয়ে দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আবার আজ একটু আগে স্বপন আর শম্ভু দু'জনেই এই চক্রধারীবাবুকে দেখে অজ্ঞান হয়ে গেল। কিন্তু চক্রধারীবাবুর কিছু হলো না। অথচ, উনিও সুবজ আলোর লোক!

চক্রধারীবাবু বললেন,—আমি সবুজ আলোর লোক কি মশাই! আমি ট্রাক চালাই। কারুর ব্যাপারে মাথা গলাই না। আমি কোনো লাল বা সবুজ আলোর লোক নই!

এই সময় স্বপন দুটো ঘরের দরজার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। এর মধ্যেই তার জ্ঞান ফিরে এসেছে।

চক্রধারীবাবু বেশ খানিকটা যেন ভয়ে ভয়েই তাকিয়ে রইলেন স্বপনের দিকে।

স্বপন এবার আর চেঁচিয়েও উঠল না, চক্রধারীবাবুকে চিনতেও পারল না।

সে বিমানের কাছে এসে বলল,—তোরা এই ঘরে বসে গল্প করছিস, আর আমাকে পাশের ঘরে শুইয়ে রেখেছিলি কেন রে?

বিমান বলল,—তুই যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলি?

স্বপন বলল,—আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম! কেন?

প্রিয়ব্রত পেছন থেকে ইঙ্গিত করছে, যাতে বিমান স্বপনকে এইসব কথা এক্ষুনি না বলে দেয়।

কিন্তু বিমান তার ইশারা দেখতে পেল না। সে আবার স্বপনকে বলল—তুই আর শম্ভু এই ভদ্রলোককে দেখামাত্র কেমন যেন হয়ে গেলি। 'সবুজ আলো', 'সবুজ আলো', বলে চেঁচিয়ে ছুটে এঁকে জড়িয়ে ধরেই অজ্ঞান হয়ে গেলি!

স্বপন চক্রধারীবাবুর পা থেকে মাথা ভালো করে দেখল। তারপর ভুরু কুঁচকে

বলল,—এই ভদ্রলোক কে? আগে তো এঁকে কখনও দেখি নি।

চক্রধারীবাবু যেন অনেকখানি স্বস্তি পেয়ে বললেন—দেখলেন তো আপনারা, আমি ঠিকই বলেছিলুম। আমিও এই ছেলেটিকে চর্মচক্ষে কোনোদিন দেখি নি।

ডক্টর মৌলিক বললেন,—ব্যাপারটা যে ক্রমশ আরও দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে প্রিয়ব্রত বাবু। যাই, শম্ভু ছেলেটার কী হলো দেখি?

তিনি পাশের ঘরে গিয়ে দেখলেন শম্ভুর জ্ঞান ফিরে এসেছে, সে খাটের ওপর বসে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে।

এর আগে স্বপন আর শম্ভু দু'জনেই অনেক বেশি সময় অজ্ঞান হয়ে ছিল। এবার ওদের জ্ঞান ফিরে এসেছে বড় জোর দশ মিনিটের মধ্যে।

এ ঘরে এসে শম্ভুও চক্রধারীবাবুকে দেখে চিনতেই পারল না।

সে কাঁদো কাঁদো ভাবে বলল,—হামার ভুখ লেগেছে। হামি ঘরকে যাবে।

চক্রধারীবাবু বললেন,—জিলিপি খাবে? স্টেশনের ধারে খুব গরম গরম জিলিপি ভাজতে দেখেছি। দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসছি।

ডক্টর মৌলিক বললেন,—না, না, আপনাকে যেতে হবে না। আমার আর্দালিই আনিয়ে দেবে।

কিন্তু চক্রধারীবাবু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে চলে গেছেন। পেছন না

ফিরেই বললেন,—আমি এই যাব আর আসব। আপনারা ততক্ষণ কথা বলুন না। আমারও খুব খিদে পেয়েছে কি না।

প্রায় দৌড়েই বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ডক্টর মৌলিক ততক্ষণ শম্ভুকে এক কাপ দুধ আর দু'খানা বিস্কুট খেতে দিলেন। স্বপন কিছুই খেল না, কারণ ও দুধ আর বিস্কুট এই দুটো জিনিসই খুব অপছন্দ করে। তা ছাড়া তার খিদেও পায় নি।

বিমান শম্ভুকে দেখিয়ে স্বপনকে জিজ্ঞেস করল,—হ্যাঁরে স্বপন তুই ছেলেটাকে আগে দেখেছিস কখন?

স্বপন বলল,—ও-ই তো পাশের ঘরে আমার পাশের খাটে শুয়ে ছিল। কে এই ছেলেটা? ওকে আগে আমি কখনও দেখিই নি।

—সে কী রে! আমরা দইজুড়ি গ্রামের দিকে গিয়েছিলাম, সেখানে রাস্তায় এই ছেলেটার সঙ্গে তোর দেখা হলো, তুই ওকে দেখে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলি! সে সব কথা তোর মনে নেই?

স্বপন বলল,—পাগলের মতন কী সব বকছিস? আমি ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরব কেন?

প্রিয়ব্রত আর বিমান চোখোচোখি করল।

প্রিয়ব্রত এবার শম্ভুকে জিজ্ঞেস করল,—শম্ভু ভাইয়া, তুম এহি দাদাকো আগাড়ি কভি দেখা?

শম্ভু বেশ বাংলা জানে। সে বলল,—না, দেখি নাই তো।

—আচ্ছা শম্ভু, তুমি সবুজ বাত্তি দেখেছো কোথাও?

শম্ভু দুদিকে মাথা নাড়লো।

বিমান হঠাৎ খুব বিরক্ত হয়ে বলে উঠল,—দূর ছাই! এ ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না। যাই হোক গে, স্বপন আর শম্ভু তো ভালো হয়ে গেছে, চল, প্রিয়দা, এবার আমরা কলকাতায় ফিরে যাই।

প্রিয়ব্রত বলল,—সেই ভালো।

এই সময় ডক্টর মৌলিক বললেন,—আমাদের চক্রধারীবাবু কোথায় গেলেন বলুন তো প্রিয়ব্রতবাবু? এখনও তো ফিরলেন না জিলিপি নিয়ে?

প্রিয়ব্রত বলল,—তাই তো, প্রায় আধঘণ্টা হয়ে গেল। উনি কি এক ঝাঁকা জিলিপি আনছেন নাকি?

ডক্টর মৌলিক বললেন,—কিন্তু আমি তো আর ওঁর জন্যে বসে থাকতে পারছি না। আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে। আপনারা বরং বসুন......

প্রিয়ব্রত বলল,—না, না আমরাও আর বসতে চাই না। আমরাও বরং স্টেশনের দিকে এগোই। চক্রধারীবাবুর কাছ থেকে ওখানেই বিদায় নিয়ে নেব। তারপর শম্ভুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমরা জিপ নিয়ে ফিরব কলকাতার দিকে।

এর পরও ডাক্তারবাবুর অনুরোধে মিনিট দশেক অপেক্ষা করল ওরা। কিন্তু চক্রধারীবাবু তখনও ফিরলেন না দেখে ডাক্তারবাবুকে হাসপাতালের কাছে ছেড়ে দিয়ে ওরা জিপটা নিয়ে চলে এল স্টেশনের কাছে। পথে চক্রধারীর দেখা পাওয়া গেল না। জিলিপির দোকানেও তিনি নেই। দোকানদারের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল, ঐ রকম চেহারার কোনো লোক তার কাছ থেকে আধঘণ্টার মধ্যে জিলিপি কিনতে আসে নি।

প্রিয়ব্রতর ভুরুদুটো কুঁচকে উঠল। ডক্টর মৌলিকের কোয়ার্টার থেকে জিলিপির দোকানটা আর কতটাই বা পথ! এর মধ্যে ভদ্রলোক কোথায় উধাও হয়ে গেলেন? নাকি ইচ্ছে করেই চলে গেলেন অন্য কোথাও?

স্টেশনের কাছে পৌঁছে ঠিক হলো শম্ভু মাহাতোকে আগে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসা হবে। সবাইকে জিপে তুলে স্টার্ট দিল প্রিয়ব্রত।

খানিকটা যাবার পর স্বপন জিজ্ঞেস করল,—আচ্ছা, প্রিয়দা, আমরা এখানে কবে এসেছি?

প্রিয়ব্রত বলল,—তা' দুদিন কেটে গেছে।

বিমান বলল—এর মধ্যে এত কিছু ঘটে গেল যে মনে হচ্ছে যেন অনেকগুলো দিন কেটে গেছে।

স্বপন জিজ্ঞেস করল,—কী কী ঘটনা ঘটেছে রে?

বিমান বলল,—সবই তো তোকে নিয়ে।

—আমাকে নিয়ে? তার মানে?

প্রিয়ব্রত গম্ভীরভাবে বলল,—ওসব কথা এখন থাক। কলকাতায় গিয়ে হবে।

দইজুড়ি গ্রামে পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না।

শম্ভু মাহাতোর বাবা লুকা মাহাতো বেশ একজন ভারিক্কি ধরনের লোক। লম্বা, পেটানো চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। তিনি তখন হাসপাতালে যাবার জন্য বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

জিপ থেকে নেমেই শম্ভু ছুটে বাবার কাছে চলে গেল। লুকা মাহাতো কপালের ওপর হাত রেখে রোদ আড়াল করে ভালো করে দেখলেন গাড়িটা, তারপর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, —আপলোগ কেয়া পুলিশ হ্যায়?

প্রিয়ব্রতর লাল রঙের জিপটা দেখে অনেকেই একথা মনে করে।

প্রিয়ব্রত মাথা নেড়ে বলল,—না, আমরা কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি।

লুকা মাহাতো এবার জিজ্ঞেস করলেন,—কী বেপার বলুন তো? হামার লেড়কাটাকে আপনারা লিয়ে চইলে গেলেন....

প্রিয়ব্রত বলল,—আপনার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তাই ওকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম।

—হাঁ, হাঁ, বিমারি তো হয়েই ছিল, তা আপনারা কেন লিয়ে গেলেন?

—আমাদের একজনেরও তো ঐ একই বেমারি। সেইজন্য তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করাবার জন্য......

—ইতো বড়া আজীব বেমারি! সবুজ বাত্তি, সবুজ বাত্তি বলে চিল্লাতে থাকে, তারপর ব্যস্! আর লড়ে না চড়ে না। ইটা কী বেমারি রে?

—ব্যাপারটা তো আমরাও বুঝতে পারছি না। তবে, আপনার ছেলেকে এখন থেকে একটু সাবধানে রাখবেন। দেখবেন, ও যেন রাত্রে একা বের না হয়। আচ্ছা, আমরা এখন তাহলে চলি।

প্রিয়ব্রত আবার স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘোরাল।

বিমান বলল,—প্রিয়দা, আমরা একদিনের মধ্যে ফিরব বলে এসেছিলুম, বাড়িতে নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছে।

স্বপন বলল,—আমার কিন্তু বেড়াতে খুব ভালো লাগছে। এদিকে আর দু' একটা জায়গা ঘুরে গেলে হয় না?

বিমান বলল,—খুব মজা না? কলেজ খুলে গেছে, মনে নেই?

প্রিয়ব্রত বলল,—আমার কিন্তু মনে হচ্ছে একবার গালুডি ঘুরে যাওয়া দরকার। চক্রধারীবাবু কোথায় হাওয়া হয়ে গেলেন? আমার ভাই খট্‌কা লাগছে।

বিমান বলল,—না, প্রিয়দা, আর দেরি করা সম্ভব নয়। বাবা রাগ করবেন।

—তুই তা হলে এক কাজ কর, বিমান। তুই আর স্বপন ফিরে যা, তোদের আমি

ট্রেনে তুলে দিচ্ছি।

স্বপন বলল,—কী বললে প্রিয়দা? আমরা ফিরে যাব?

—হ্যাঁ, সেটাই তো ভালো।

—কথাটা তুমি বলতে পারলে!

—তোদের কলেজ খুলে গেছে, তোরা কলকাতায় ফিরে যা। আমি ব্যাপারটা আরও একটু ভালো করে দেখে যেতে চাই।

—তুমি একলা একলা মজা করবে, আর আমরা কলকাতায় গিয়ে কলেজ করব?

—এর মধ্যে আবার মজার কী আছে?

বিমান মুখ গোঁজ করে বসে আছে, আর কোনো কথাই বলছে না। বোঝাই যায় সে রেগে গেছে খুব। হঠাৎ সে বলে উঠল,—চক্রধারীবাবুর বাড়িতে গিয়ে কি লাভ হবে? উনি বলবেন, আমার ইচ্ছে হয়েছে, তাই চলে এসেছি।

—তা বলে আমাদের কিছু না বলে এভাবে চলে যাবেন?

—কতক্ষণ লাগে গালুডি যেতে?

—খুব বেশি দূর তো নয়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব।

—তাহলে চল, আমরা সবাই মিলে সেখানে যাই। চক্রধারীবাবুর সঙ্গে কথা বলতে আর কতক্ষণ লাগবে? তারপর আমরা সবাই একসঙ্গে কলকাতায় ফিরব।

—কিন্তু যদি কোনো কারণে দেরি হয়ে যায়? আমরা অন্যদিকে চলে যাচ্ছি তো। হয়তো আজ রাতের মধ্যে কলকাতায় ফেরাই হবে না! সেইজন্যই বলছি, তোরা বরং ট্রেনে চেপে ফিরে যা।

স্বপন বলে উঠল,—না, তা কিছুতেই হবে না।

প্রিয়ব্রত বলল,—তাহলে এক কাজ করে নেওয়া যাক। আগে তোদের কারুর একজনের বাড়িতে একটা ট্রাঙ্কল কিংবা টেলিগ্রাম পাঠান যাক। দায়িত্ব তো আমাকেই নিতে হবে।

ঝাড়গ্রাম স্টেশনের কাছে আবার ফিরে এল সবাই। এবার ভাগ্য ভালো। পোস্টঅফিস থেকে কলকাতায় লাইন পাওয়া গেল। বিমানের বাবাকে সব কথা বুঝিয়ে বলল প্রিয়ব্রত। তারপর স্বপন আর বিমান যে ভালো আছে সে কথা বোঝাবার জন্যে ওরাও টেলিফোনে কথা বলল একটু করে।

টেলিফোন করার পর একটু নিশ্চিন্ত হয়ে আর এক কাপ করে চা খেয়ে নিয়ে এবার ওরা ছুটল গালুডির দিকে।

এর আগে ওরা স্টেশন থেকে খবর নিয়ে এসেছে যে ইতিমধ্যে একখানা ট্রেন গেছে গালুডির দিকে। তাছাড়া বাসেও যাওয়া যায় অবশ্য। অর্থাৎ চক্রধারীবাবুর এর মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাবার কথা। গালুডি পৌঁছে চক্রধারীবাবুর বাড়ি খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধেই হলো না। ছোট জায়গা, সবাই সবাইকে চেনে। তাছাড়া, চক্রধারীবাবুর যখন ট্রাকের ব্যবসা, তখন পেট্রোল পাম্পের লোকেরা চিনবেই।

জিপ গাড়িতে পেট্রোল ভরে নেবার জন্য ওরা সেখানে ঢুকে পড়ল। যে ছেলেটি

পেট্রোল দেয়, তাকে চক্রধারীবাবুর নাম বলতেই সে হাত তুলে দেখিয়ে দিয়ে বলল,—ঐ যে মাঠের ওধারে ছোট্ট সাদা কুঠিটা দেখছেন, ওটাই।

চক্রধারীবাবু নিজের বাড়ির যে-রকম বর্ণনা দিয়েছিলেন, বাড়িটা সেই রকমই। সামনে একটা ছোট্ট বাগান, সেখানে অনেকগুলো পুরোনো লরি টরি পড়ে আছে।

গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই একজন বুড়ো মতন লোক বাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল,—কৌন?

প্রিয়ব্রত বলল,—চক্রধারীবাবু হ্যায়?

বুড়ো কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেল ভেতরে। এরপর বেরিয়ে এল একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে।

সে জিজ্ঞেস করল,—আপনারা কাকে চান? কোথা থেকে আসছেন?

প্রিয়ব্রত বলল,—আমরা আসছি ঝাড়গ্রাম থেকে। একবার চক্রধারীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

প্রিয়ব্রত আশা করেছিল, এবার মেয়েটি বলবে, উনি তো ঝাড়গ্রামেই গেছেন। কিংবা উনি তো ঝাড়গ্রাম থেকে এই মাত্র ফিরলেন।

কিন্তু মেয়েটি সে কথা বলল না, একটু অবাকও হলো না। সে বলল,—উনি তো ঘুমোচ্ছেন।

ঘড়িতে বাজে সকাল সাড়ে এগারোটা। এসময় কোনো মানুষের ঘুমোবার কথা নয়। চক্রধারীবাবু কি ঝাড়গ্রাম থেকে এসেই ঘুমিয়ে পড়লেন?

প্রিয়ব্রত বলল,—একটু বিশেষ দরকার আছে। ওঁকে ডাকা যায় না?

মেয়েটি বলল,—তা হয়তো যায়। কিন্তু সাড়া কি পাওয়া যাবে? উনি তো দু'দিন ধরেই একটানা ঘুমোচ্ছেন।

বিমান চমকে উঠে বলে উঠল,—দু'দিন ধরে?

বিমান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, প্রিয়ব্রত তার হাত চেপে ধরে বলল,—তাই নাকি? কেন, ওঁর কি কোনো অসুখ করেছে?

মেয়েটি বলল,—তা তো, বুঝতে পারছি না। কেন যেন দু'দিন ধরে ঘুমিয়ে রয়েছেন।

—জাগাবার চেষ্টা করেন নি?

—হ্যাঁ, ডাকলে সাড়া দিচ্ছেন বটে, চোখ মেলে চাইছেনও। আবার ঘুমিয়ে পড়ছেন।

প্রিয়ব্রত দু'এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল,—আপনি চক্রধারীবাবুর মেয়ে নিশ্চয়ই?

মেয়েটি ঘাড় হেলিয়ে বলল,—হ্যাঁ। কিন্তু আপনারা জানলেন কী করে?

বিমান আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, প্রিয়ব্রত তাকে বাধা দিয়ে বলল —ওঁকে আমরা চিনি তো, ওঁর মুখ থেকেই আপনার কথা শুনেছি। যদি কিছু মনে না করেন, আমরা একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি?

মেয়েটি বলল—হ্যাঁ, আসুন না।

মেয়েটি ওদের নিয়ে গেল ভেতরের একটি ঘরে। পুরনো আমলের একটা খাটে শুয়ে আছেন চক্রধারীবাবু। সকালবেলা ওঁকে যে পোষাকে ঝাড়গ্রামে দেখা গিয়েছিল, অবিকল সেই পোষাক।

বিমান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটি দারুণ মিথ্যেবাদী তো। বলে কিনা দু'দিন ধরে একটানা ঘুমোচ্ছে—তাহলে সকালে দেখা হলো কার সঙ্গে?

প্রিয়ব্রত এগিয়ে গিয়ে চক্রধারীবাবুর শিয়রের কাছে দাঁড়াল।

বিমান আর স্বপন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, প্রিয়ব্রত হাতছানি দিয়ে বলল,—স্বপন, তুই আমার কাছে আয় তো।

স্বপন কাছে আসতেই প্রিয়ব্রত ফিসফিস করে ডাকল,—চক্রধারীবাবু, ও চক্রধারীবাবু।

কোনো সাড়া নেই।

দু' তিনবার ডেকে যখন কোনো ফল হলো না, তখন প্রিয়ব্রত ওঁর গায়ে হাত দিয়ে একটু ঠেলল। সঙ্গে সঙ্গে উনি চোখ মেললেন। মুখ ঘুরিয়ে প্রথম দেখলেন প্রিয়ব্রতকে। তারপর স্বপনের দিকে চোখ পড়তেই উনি আস্তে আস্তে উঠে বসলেন, তারপর দু'হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন,—সবুজ আলো!

সে চিৎকার শুনে স্বপন পিছিয়ে গেল কয়েক পা। উত্তরে সে কিন্তু সবুজ আলো বলে চেঁচাল না। বরং চক্রধারীবাবু স্বপনকে জড়িয়ে ধরবার জন্যে উঠে আসতেই স্বপন যেন খানিকটা ভয় পেয়েই দৌড় দিল।

প্রিয়ব্রত কড়া গলায় বলে উঠল—কোথায় যাচ্ছেন? বলেই চক্রধারীবাবুর হাতটা

চেপে ধরল।

অমনি একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেল।

প্রচণ্ড বিদ্যুতের শক্ লাগলে যেন হয় তেমনি কেঁপে উঠল প্রিয়ব্রতর সমস্ত শরীরটা। সে যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ শব্দ করে দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দারুণ কর্কশ গলায় 'সবুজ আলো', 'সবুজ আলো' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে চক্রধারীবাবু দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন স্বপনের দিকে।

স্বপনের মুখখানা ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। সে 'না', 'না' বলে চেঁচিয়ে উঠে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই সমস্ত ঘটনা ঘটে যাওয়ায় বিমান প্রথমটায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। স্বপন কেন অত ভয় পাচ্ছে, সে বুঝতে পারল না। প্রিয়দাই বা কেন পড়ে গেল মাটিতে? চক্রধারীবাবুরই বা ওরকম করার কারণ কী? সে স্বপনকে সাহায্য করবার জন্যে বাইরে যাবে, না প্রিয়দাকে আগে দেখবে?

প্রিয়ব্রত মাটিতে পড়ে গিয়ে গড়াচ্ছে আর গোঁ গোঁ শব্দ বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে। হঠাৎ তার শরীরটা থেমে গেল, মুখের আওয়াজও বন্ধ হলো।

বিমান তক্ষুনি প্রিয়ব্রতর পাশে বসে পড়ে ব্যাকুলভাবে ডাকল,—প্রিয়দা! প্রিয়দা।

কোনো সাড়া নেই!

চক্রধারীবাবুর মেয়ে সীতা এই সব দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল।

বিমান বলল,—জল! শিগগির একটু জল নিয়ে এস।

সেই ঘরেই একটা জলের কলসী ছিল। সীতা তার থেকে জল গড়াতে লাগল।

প্রিয়ব্রতর শরীরটা এমনই নিস্পন্দ হয়ে গেছে যে, বিমানের একবার মনে হলো, প্রিয়দা মরে যায় নি তো? চক্রধারীবাবুকে ছোঁয়া মাত্র এরকমটা হলোই বা কেন?

বিমান প্রিয়ব্রতর শরীরটাকে চিৎ করে তার বুকে মাথা কান ছোঁয়াল। হ্যাঁ, একটু দুপ্ দুপ্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখল, নিশ্বাসও পড়ছে একটু একটু।

সীতা এক ঘটি জল নিয়ে আসতেই বিমান সেই জল সবটা ছিটিয়ে দিতে লাগল প্রিয়ব্রতর চোখে মুখে। কয়েকবার ঝাপটা লাগাবার পর প্রিয়ব্রতর চোখ দুটো পিট পিট করে উঠল একবার।

বিমান ব্যাকুল ভাবে ডাকল—প্রিয়দা, প্রিয়দা!

এবার প্রিয়ব্রত ভালোভাবে তাকিয়ে বলল,—ভয় নেই, আমি ঠিক আছি।

বিমান জিজ্ঞেস করল,—তোমার কী হয়েছিল? চক্রধারীবাবু তোমায় কী করলেন?

সীতা প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল,—আমার বাবা এরকম করছেন কেন? আপনারা কে? কোথা থেকে আসছেন?

প্রিয়ব্রত ধড়মড় করে উঠে বসে সীতার দিকে তাকিয়ে বলল,—ঐ লোকটা তোমার বাবা নয়। তারপর বিমানকে জিজ্ঞেস করল—স্বপন কোথায়?

বিমান বলল,—স্বপন বাইরে পালিয়েছে। চক্রধারীবাবু ওকে তাড়া করে গেছেন।

প্রিয়ব্রত বলল—ঐ লোকটা কিছুতেই চক্রধারীবাবু হতে পারেন না। নিশ্চয়ই অন্য কেউ। শিগগির চল্। স্বপনকে বাঁচাতে হবে।

সকলে হুড়মুড়িয়ে চলে এল ঘরের বাইরে।

বাড়িটার সামনের মাঠে তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার চলছে।

চক্রধারীবাবু স্বপনকে ধরবার জন্য তাড়া করে চলেছেন আর স্বপন গোল হয়ে ঘুরছে। চক্রধারীবাবুর হাত দুটো একরকম ভাবে সামনে বাড়ানো। কানামাছি খেলার সময় চোখ-বাঁধা ছেলেরা সামনে দু'হাত বাড়িয়ে যেমন ছোটে, ঠিক সেই রকম দেখাচ্ছে।

প্রিয়ব্রত চেঁচিয়ে বলল,—স্বপন, সাবধান! দেখিস, তোকে যেন কিছুতেই ধরতে না পারে!

সীতা কয়েক পা এগিয়ে যেতে যেতে বলল,—বাবা, তোমার কী হয়েছে? তুমি ওরকম করছ কেন?

প্রিয়ব্রত চট্ করে সীতার হাত ধরে টেনে এনে বলল,—খবরদার, ওকে ছুঁয়ো না। বললুম না, ঐ লোকটা তোমার বাবা নয়।

সীতা বলল,—আমার বাবা নয়? তা হলে ও কে? আমার বাবা তবে কোথায় গেল?

প্রিয়ব্রত বলল,—সব কথা এখন বুঝিয়ে বলার সময় নেই। পরে বলব। ঐ লোকটা স্বপনকে ধরে ফেললেই খুব বিপদ হবে! হ্যাঁ শোন, তোমাদের বাড়িতে বাঁশের লাঠি আছে?

গোলমাল শুনে এর মধ্যে সীতার মা আর সেই বুড়ো লোকটিও এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাড়ির বাইরে। সীতার মা বললেন,—অ সীতা, এসব কী কাণ্ড হচ্ছে? উনি অমন করছেন কেন?

সীতা কিছু বলবার আগেই প্রিয়ব্রত প্রায় ধমক দিয়ে বলল,—লাঠি আনতে বললুম না! লাঠি কই?

সীতা দৌড়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

চক্রধারীবাবুর মতন দেখতে লোকটা তখনও ছুটছে আর স্বপন কিত্ কিত্ খেলার কায়দায় একবার এদিকে আর একবার ওদিকে পালাচ্ছে।

সীতা এই সময় একটা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে এল।

প্রিয়ব্রত বলল,—না, এতে হবে না! বাঁশের লাঠি নেই?

বুড়ো লোকটি বলল,—লাঠি? ও সীতা, আমার লাঠিটা এনে দে।

সীতা এবার নিয়ে এল একটা তেলচকচকে বাঁশের লাঠি।

প্রিয়ব্রত সেটা হাতে বাগিয়ে ধরে এগিয়ে গেল চক্রধারীবাবুর মতন দেখতে লোকটার দিকে।

সীতাও তার সঙ্গে সঙ্গে এসে বলল,—একী, আপনি আমার বাবাকে মারবেন নাকি?

প্রিয়ব্রত বলল,—বললুম তো, ঐ লোকটা তোমার বাবা নয়!

সীতা বলল,—আপনার কথা আমি বিশ্বাস করব কেন? আমার বাবাকে আমি চিনি না? বাবা হঠাৎ অদ্ভুত মতন ব্যবহার করছে বলেই আপনি তাকে লাঠি দিয়ে মারবেন?

বিমানও এগিয়ে এসেছে প্রিয়ব্রতর পাশে পাশে। প্রিয়ব্রত তাকে বলল,—বিমান, এই মেয়েটিকে ধরে থাক, দেখিস যেন এগোতে না পারে। তোরা দু'জনেই দূরে থাকবি, কোনোমতেই যেন ঐ লোকটার সঙ্গে তোদের ছোঁয়া না লাগে!

বিমান সীতার একটা হাত চেপে ধরতেই সে জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বলল,—ছেড়ে দিন। আমায় ছেড়ে দিন। আপনারা কে? কেন আমার বাবাকে মারছেন?

বিমান বলল—ভয় নেই, কিচ্ছু ভয় নেই। আমরা তোমার কিংবা চক্রধারীবাবুর শত্রু নই। আমরা এসেছি কলকাতা থেকে। এখানে ভয়ংকর কিছু কাণ্ড চলছে। প্রিয়দা পরে সব বুঝিয়ে বলবে।

প্রিয়ব্রত লাঠিটা উঁচিয়ে ধরে চক্রধারীবাবুর মতন লোকটির দিকে এগিয়ে গেল এক পা এক পা করে। প্রিয়ব্রতকে দেখে সাহস পেয়ে স্বপন তার পাশে এসে দাঁড়াল।

লোকটা তখনও হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে স্বপনের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল—সবুজ আলো! সবুজ আলো!

প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করল,—আপনি কে?

লোকটা সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সোজা এগিয়ে আসতে লাগল স্বপনের দিকে।

প্রিয়ব্রত বলল,—কে আপনি? কেন ওকে ধরতে চাইছেন? ওকে আপনি কিছুতেই ধরতে পারবেন না!

লোকটা সে কথা গ্রাহ্যই করল না।

তখন প্রিয়ব্রত হাতের লাঠিটা ঘুরিয়ে খুব জোরে মারল লোকটার পায়ে।

সেই মার খেয়ে লোকটা লাফিয়ে উঠল। এত উঁচুতে লাফিয়ে উঠল সে যা কোনো মানুষের পক্ষে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লাফিয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

প্রিয়ব্রত তখন স্বপনকে ঠেলে দিয়ে বললে,—তুই সরে যা। লোকটাকে আমি ঠাণ্ডা করছি। ঐ বাড়ির মধ্যে পালিয়ে যা তুই।

লোকটা মাটিতে নেমে এবার প্রিয়ব্রতর দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

প্রিয়ব্রত বলল,—এখনও বলুন আপনি কে? কী চান এখানে?

লোকটার চোখে হঠাৎ যেন আগুন জ্বলে উঠল। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল,—সবুজ

আলো!

প্রিয়ব্রতর মনে হলো, সে ঐ কথা দুটো ছাড়া আর কোনো কথা জানে না।

লোকটা এইবার প্রিয়ব্রতর দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগল।

প্রিয়ব্রত বলল,—সাবধান, আমাকে ধরবার চেষ্টা করবেন না। আমি জানি, আপনার শরীরে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আছে।

লোকটা তবু এগিয়ে এল ওকে ধরতে।

প্রিয়ব্রত এবার লাঠিটা ঘুরিয়ে মারতে গেল লোকটার কাঁধে। কিন্তু ওর গায়ে লাগবার আগেই লোকটা হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল লাঠিটা। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিল সেটা। অসম্ভব শক্তি লোকটার গায়ে। সেই টানের চোটে প্রিয়ব্রত নিজেই আর একটু হলে পড়ে যাচ্ছিল হুমড়ি খেয়ে।

লোকটা কিন্তু লাঠিটা নিয়ে প্রিয়ব্রতকে সেটা দিয়ে উল্টে মারবার চেষ্টা করল না। লাঠিটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাত বাড়িয়ে এল প্রিয়ব্রতকে ধরতে।

এবার প্রিয়ব্রত পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে কয়েক পা পিছিয়ে গেল দৌড়ে। তারপর রিভলবারের নিশানা ঠিক করে বলল,—আমি সাবধান করে দিচ্ছি, মানুষ মারতে আমি চাই না, কিন্তু আর এক পা এগোলেই গুলি ছুঁড়ব।

এর মধ্যে মাঠের এক দিকে কিছু লোকের ভিড় জমে গেছে। তারা কেউ বুঝতে পারছে না কী ব্যাপার চলছে। প্রিয়ব্রতকে রিভলবার বার করতে দেখে সবাই ভয়ে শব্দ করে উঠল।

হঠাৎ সেই ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এলেন আর একজন চক্রধারীবাবু।

তিনি দু'হাত তুলে বললেন,—কী ব্যাপার? ও প্রিয়বাবু, এসব কী ভুতুড়ে কাণ্ড হচ্ছে আমার বাড়িতে? এই লোকটা কে?

প্রিয়ব্রত চেঁচিয়ে বলল,—আসবেন না, এদিকে আসবেন না। আপনি দূরে থাকুন।

চক্রধারীবাবু বললেন,—এ যে দেখছি ঠিক আমারই মতন চেহারার একজন লোক। এ কী কাণ্ড? অ্যাঁ? এ কোথা থেকে এল?

প্রিয়ব্রত বলল,—বলছি, এখানে আসবেন না! দূরে থাকুন।

প্রথম লোকটি এবার দ্বিতীয় চক্রধারীবাবুর দিকে ফিরে হুকুমের সুরে বলল,—সবুজ আলো! সবুজ আলো!

সেই কথা শুনে দ্বিতীয় চক্রধারীবাবু কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়লেন।

প্রিয়ব্রত দেখল, ভিড় ঠেলে স্বপনও আবার এদিকে ছুটে আসছে।

প্রিয়ব্রত বলল,—স্বপন, স্বপন, আসিস নি। পালিয়ে যা।

স্বপন সে নিষেধে কান না দিয়ে দ্বিতীয় চক্রধারীবাবুর পাশে এসে মাটিতে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। তারপর দু'জনে এক সঙ্গে এমন ভাবে হাত জোড় করে রইল, যেন ওরা ঐ লোকটিকে পুজো করছে।

প্রিয়ব্রতর মনে হলো, লোকটির চোখ দিয়ে সবুজ মতো একটা অস্বাভাবিক

আলো বেরুচ্ছে। আর সে কাঠের পুতুলের মতন টলতে টলতে এগিয়ে আসছে চক্রধারীবাবু আর স্বপনের দিকে।

প্রিয়ব্রত আর ঝুঁকি নিতে চাইল না। লোকটিকে একবার ছুঁয়ে সে নিজেই বুঝেছে যে ওর গায়ে অসম্ভব জোরালো বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আছে। ও যদি চক্রধারীবাবু আর স্বপনকে জড়িয়ে ধরে, তাহলে ওরা দু'জন আর বাঁচবে না।

প্রিয়ব্রত খানিকটা এগিয়ে এসে স্বপনদের আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলল,—তুমি যে-ই হও, আমি এখনও সাবধান করে দিচ্ছি। আর এক পা এগোলেই আমি গুলি করব।

লোকটা তবু এগোবার জন্য পা বাড়াতেই গুলি চালাল প্রিয়ব্রত।

ওর হাতে টিপ সাংঘাতিক। তার ওপর এত কাছ থেকে ছুঁড়েছে, গুলি না লেগে পারেই না। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল লোকটা।

দিন-দুপুরে এমন অদ্ভুত কাণ্ড কেউ কখনও দেখে নি।

মাত্র দশ-বারো হাত দূর থেকে গুলি ছুঁড়েছে প্রিয়ব্রত, মানুষ হলে গায়ে না লেগে পারত না। কিন্তু লোকটা কি তাহলে মানুষ নয়? কোথায় গেল সে? প্রিয়ব্রতর সারা শরীরটা কাঁপতে লাগল উত্তেজনায়।

দূরে যারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা ভূত মনে করে ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

বিমানও এসব দেখে এমন অবাক হয়ে গিয়েছিল যে বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারল না। তার মনে শুধু তোলপাড় করতে লাগল—এটা কোনো ভুতুরে ব্যাপার, না অলৌকিক কাণ্ড? চোখের সামনে থেকে একটা মানুষ এ ভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে কী করে!

ওদিকে স্বপন আর চক্রধারীবাবু তখনও বসে আছেন সেই এক ভাবে। চোখ বড় বড় করে খোলা, পলক পড়ছে না।

প্রিয়ব্রতই প্রথমে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে বলল,—চল বিমান, আমাদের এরকম খোলা মাঠের মধ্যে থাকা এখন উচিত নয়। কোন একটা বাড়ির মধ্যে আশ্রয় নিতে হবে আমাদের।

বিমান খানিকটা তোতলাতে তোতলাতে বলল,—প্রি-প্রি—প্রিয়দা, ব্যাপারটা কী-কী-কী হলো?

প্রিয়ব্রত বলল,—সে পরে আলোচনা করা যাবে। এখন স্বপনদের তুলতে হবে।

হঠাৎ আকাশে একটা গুম্ গুম্ শব্দ শোনা গেল। মনে হল অনেকটা দূর দিয়ে যেন একটা জেট প্লেন উড়ে যাচ্ছে।

বিমান দু' পা এগিয়ে গিয়ে বলল,—এই স্বপন ওঠ, চক্রধারীবাবু, উঠুন।

ওরা কোনো সাড়া দিল না। বিমান স্বপনের গায়ে ধাক্কা দিয়ে দেখল, শরীরটা যেন কাঠের মতন শক্ত হয়ে গেছে।

প্রিয়ব্রত রিভলবারটা তখনও পকেটে ভরে নি। চারদিক ঘুরে একবার দেখে নিল

খুব সাবধানে। সেই লোকটা কোথাও নেই, সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সীতা ছুটতে ছুটতে এসে বলল,—আমার বাবা···আমার বাবাকে আপনি গুলি করলেন···! বাবা কোথায় গেল? ইনি কে?

প্রিয়ব্রত বলল,—ইনিই তোমার বাবা! তুমি ওঁকে ধরো, এক্ষুণি বাড়ির মধ্যে নিয়ে যেতে হবে।

সীতা জিজ্ঞেস করল, তা হলে আগে যে ছিল সে কে?

প্রিয়ব্রত বলল, সে তোমার বাবার কার্বন কপি।

—তার মানে?

—সব এখন বুঝিয়ে বলার সময় নেই। আগে তোমার বাবাকে টেনে তোল।

কিন্তু ওরা সবাই মিলে টানাটানি করেও স্বপন আর চক্রধারীবাবুকে তুলতে পারল না। ওরা দু'জনে যেন জড়-ভরত হয়ে গেছে। মুখে কোনো কথা নেই, মানুষ চিনতে পারছে না।

ওদিকে আকাশে গুম্-গুম্ শব্দটা ক্রমেই জোর হচ্ছে। প্রিয়ব্রত মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। তারপর সে আর একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল।

সকাল থেকেই আকাশটা ছিল মেঘলা। মেঘ ক্রমেই জমাট বাঁধছিল। হঠাৎ দেখা গেল, আকাশে ঘন মেঘের পর্দার মাঝখানটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। ঠিক যেন মেঘ কেটে বেরিয়ে আসছে একটা খুব চওড়া নদী। কিন্তু কী দিয়ে যে মেঘটা ওরকম ভাবে কেটে যাচ্ছে, তা বোঝা যাচ্ছে না।

প্রিয়ব্রত চেঁচিয়ে বলল,—আর একটুও সময় নেই বিমান, তুই আর সীতা মিলে স্বপনকে জোর করে টেনে নিয়ে যা। আমি চক্রধারীবাবুকে কাঁধে তুলে নিচ্ছি।

কিন্তু সে সুযোগ আর ওরা পেল না। সেই চক্রধারীবাবুর মতন দেখতে লোকটা আবার ফিরে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল।

এখন আর তাকে 'লোকটা' বলা যায় না। ঠিক যেন একটা স্ফটিকের মূর্তি, তার সারা গা দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে! তার চোখ দুটোর জায়গায় এখন কিছুই নেই। কপাল থেকে বেরিয়ে আসছে একটা তীব্র সবুজ আলোর রেখা।

প্রিয়ব্রত রিভলবারটা উঁচু করেও গুলি ছুঁড়তে পারল না। তার আগে নিজেই 'সবুজ আলো' বলে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল।

বিমান আর সীতারও সেই অবস্থা। তারাও ঐ একই রকম চিৎকার করতে করতে পড়ে গেল মাটিতে। স্ফটিকের মূর্তিটা একটা হাত তুলল স্বপন আর চক্রধারীবাবুর দিকে। অমনি তারা দু'জন মন্ত্রমুগ্ধের মতন উঠে দাঁড়িয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল তার দিকে!

মাথার ওপরে জেট প্লেনের মতো সেই শব্দটা এখন সাংঘাতিক জোর হয়ে

উঠছে। কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

পরের মুহূর্তেই সেই মূর্তিটা স্বপন আর চক্রধারীবাবুকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল আকাশের বুকে।

বিকেলের মধ্যেই গালুডি শহর একেবারে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। দূর দূর জায়গা থেকে লোক ছুটে আসছে। পুলিশের বড় বড় কর্তা, আরও অনেক সরকারি ব্যক্তিও এসেছেন। ঠিক কী যে হয়েছে ব্যাপারটা, কেউই সঠিক বলতে পারছে না।

মাঠ থেকে অজ্ঞান অবস্থায় প্রিয়ব্রত, বিমান আর সীতাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। সেখানে তাদের জ্ঞান ফেরবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

দেশ-বিদেশের সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফাররা এল তার পরের দিন। প্রিয়ব্রতদের অজ্ঞান অবস্থার ছবি ছাপা হলো অনেক কাগজে। তা দেখে বিমান আর স্বপনের বাবা ছুটে এলেন গালুডিতে।

তিন দিন পরে প্রথম জ্ঞান ফিরে এল প্রিয়ব্রতর। তারপর বিমান আর সীতার।

বিছানায় উঠে বসেই প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করল,—আমার কী হয়েছিল?

তখন পুলিশের লোক আর রিপোর্টাররা ছেঁকে ধরল প্রিয়ব্রতকে। সবাই এক সঙ্গে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। প্রিয়ব্রত একটারও উত্তর দিল না। সে খালি বলতে লাগল, আমার কী হয়েছিল, আগে বলুন! আমার তো কিছু মনে পড়ছে না।

তারপর এসে পড়ল মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের লোক। সবাইকে সরিয়ে দিয়ে তারা ওদের তিনজনকে নিয়ে চলে গেল জামসেদপুরে। সেখানে কোনো গোপন জায়গায় ওদের জেরা চলতে লাগল।

পরেরদিন জামসেদপুরে বসেই ওরা খবর পেল যে চক্রধারীবাবু ফিরে এসেছেন। ভোরবেলা তাঁর বাড়ির সামনের মাঠে তাঁকে পাওয়া গেছে অজ্ঞান অবস্থায়। শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। ঠিক যেন ঘুমোচ্ছেন।

তক্ষুণি জামসেদপুর থেকে মিলিটারির গাড়ি চলে গেল চক্রধারীবাবুকে নিয়ে আসবার জন্যে।

স্বপনের বাবা ট্রাঙ্ক কল্ করলেন কলকাতায়। তাতে জানলেন যে স্বপনও ফিরে এসেছে। তাকেও অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে ছাতে, সেই দক্ষিণেশ্বরে মামাদের বাড়িতে।

মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের লোক, পুলিশ আর ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেও প্রিয়ব্রতদের থেকে কোনো খবর বার করতে পারল না। সত্যিই ওদের কারুর কিছু মনে নেই। এমনকি নিজেদের নামও ওরা ভালো করে মনে করতে পারছে না।

দিনসাতেক বাদে ছেড়ে দেওয়া হলো ওদের। ওরা যে যার বাড়িতে ফিরে গেল।

সীতা বাড়ি ফিরে চক্রধারীবাবুকে দেখেই কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। চক্রধারীবাবুও সীতাকে দেখে চিনতে পারলেন না, শুধু জিজ্ঞেস করলেন, এই মেয়েটি কে?

দু'জনকে শুইয়ে রাখা হলো আলাদা দুটো ঘরে।

তিনদিন পরে। চক্রধারীবাবু হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন,—বাবা রে বাবা! আমি কতকাল এরকম ঘুমিয়ে কাটাচ্ছি? আমার ব্যবসা-পত্তর সব যাবে যে। সীতা, ও মা সীতা! আমার খাবার দিতে বল। আমি আজই ট্রাক নিয়ে বেরুব।

সীতাও খুব স্বাভাবিক ভাবেই এ-ঘরে চলে এসে বলল,—বাবা, তুমি তো আজ বাজারই কর নি, রান্না হবে কী?

ক্রমে সবই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। মাঝখানে যেন কিছুই ঘটেনি। মাঝের সেই অংশটা ওদের কারুরই একদম মনে নেই। এখনও অন্য কেউ এসে চক্রধারীবাবুকে যখন জিজ্ঞেস করে, আপনি যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তারপর কী হয়েছিল? তখন চক্রধারীবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। কিংবা কখনও রাগ করে বলে ওঠেন, কী বাজে কথা বলছেন? আমি আবার অদৃশ্য হলুম কবে!

ওদিকে কলকাতায় স্বপন, বিমান আর প্রিয়ব্রতও স্বাভাবিক হয়ে উঠল আস্তে আস্তে। সবুজ আলোর কোনো ঘটনাই এখন ওদের মনে নেই। স্বপন আর বিমান কলেজে যাওয়া শুরু করে দিয়েছে। প্রথম প্রথম ওদের বন্ধুরা খুব বিরক্ত করত ওদের। খবরের কাগজে সব ঘটনা পড়েছিল তারা। তারা চেপে ধরত স্বপন আর বিমানকে—হ্যাঁরে, স্বপন, তুই সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলি, না কোথাও লুকিয়ে ছিলি ঘাপটি মেরে? কিরে, বিমান, তুই নাকি চারদিন একটানা ঘুমিয়ে ছিলি? গুল দেবার আর জায়গা পাস নি তোরা?

স্বপন আর বিমান কোনো কথা বলে না। চুপ করে থাকে। আর বলবেই বা কী? সত্যিই তো তাদের কিছু মনে নেই।

এরপর কেটে গেছে প্রায় ছ'মাস।

এর মধ্যে প্রিয়ব্রত বম্বে, গোয়া আর আরও অনেক জায়গায় ঘুরে এসেছে। আগামী মাসেই সে তার লাল জিপটা নিয়ে ইউরোপের দিকে বেরিয়ে পড়বে ঠিক করেছে।

সেদিন একটা বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্নয় ওদের তিনজনের দেখা হলো অনেক দিন পরে। খাওয়া দাওয়া সারতে সারতে অনেক রাত হয়ে গেল ওদের। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটছে তিনজনে, এমন সময় আকাশে একটা গুর্ গুর্ আওয়াজ হতেই ওরা চমকে তাকাল ওপরের দিকে।

নাঃ, অন্য কিছু নয়! লাল-নীল আলো জ্বেলে উড়ে যাচ্ছে একটা সত্যিকারের জেট প্লেন।

প্রিয়ব্রত হঠাৎ জিজ্ঞেস করল,—সে সব দিনের কথা তোদের কিছু মনে পড়ে না, না রে?

বিমান বলল,—গত কয়েকদিন ধরে আমার যেন ঝাপসা মতন মনে পড়ছে। তবে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি কিনা তাও বুঝতে পারছি না। একটা স্ফটিক দিয়ে গড়া

মূর্তির মতন মানুষ। তার চোখ নেই। কপাল দিয়ে বেরুচ্ছে কী রকম যেন ধক্‌ধকে সবুজ আলো!

স্বপন বলল,—আরে! আমিও তো ভাবছিলুম যে ওটা স্বপ্ন। পরশু থেকে বারবার যেন দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে।

প্রিয়ব্রত বলল,—তা হলে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের তিনজনেরই স্মৃতি ফিরে আসছে এক সঙ্গে। আমার আরও মনে পড়ছে। ঠিক চক্রধারীবাবুর মতন চেহারার একটা নকল লোক এসেছিল। সেই লোকটাকে আমি গুলি করতেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার সে-ই ফিরে এল একটা স্ফটিকের মূর্তি হয়ে।

বিমান বলল,—হ্যাঁ, এসবই আমরা নিজের চোখে দেখেছি ঠিকই, তবু কেন যেন বিশ্বাস করতে পারছি না!

প্রিয়ব্রত বলল—চল, সামনের পার্কটায় একটু বসি।

স্বপন বলল,—রাত্তির বেলা খোলা জায়গায় বসলে আজকাল আমার কেমন যেন গা ছম্‌ ছম্‌ করে।

—কেন রে?

—দু'দিন আগেও বুঝতুম না কেন ভয় করে। আজ বুঝতে পারছি। সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে যায় বলে। আবার যদি সে রকম সবুজ আলো দেখি!

পার্কের বেঞ্চিতে বসে প্রিয়ব্রত বলল—ভয়ের কী আছে? আর যাই হোক, যারা ঐ সবুজ আলো দেখিয়েছিল, তারা তো আমাদের কোনো ক্ষতি করে নি। যদিও ইচ্ছে করলেই তারা আমাদের মেরে ফেলতে পারত।

বিমান জিজ্ঞেস করল,—যারা মানে কারা প্রিয়দা?

প্রিয়ব্রত বলল,—জোর দিয়ে কিছু বলা শক্ত। তবে, তোরা 'এনকাউন্টার অফ দ্য থার্ড কাইণ্ড' ফিল্মটা দেখেছিস? আমার মনে হয় সেরকমই কিছু ব্যাপার।

বিমান বলল,—না ঐ ফিল্মটা দেখি নি। কী ছিল তাতে?

প্রিয়ব্রত বলল,—অন্য কোনো গ্রহের বুদ্ধিমান্‌ প্রাণী আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে। তারা আমাদের শত্রু নয়। কিন্তু তারা তো আমাদের ভাষা জানে না, তাই ঠিকমতো যোগাযোগ করতে পারছে না কিছুতেই। এবারও মনে হয় সেইরকম একটা চেষ্টা করেছিল।

বিমান বলল,—ঐ সবুজ আলো দেখলেই আমরা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যেতাম কেন?

—ওরা বোধহয় ঐ আলো দিয়েই কথা বলে। কিন্তু আমরা ঐ অত কড়া আলো সহ্য করতে পারি না। কিংবা আর একটা ব্যাপারও হতে পারে। ঐ আলো দিয়ে ওরা হয়তো আমাদের ছবি তুলে নিয়েছে। ঠিক সাধারণ ছবি নয়। তৈরি করে নিয়েছে অবিকল আমাদের মতন একটা করে মানুষ। যে রকম ভাবে একজন দ্বিতীয় চক্রধারীবাবুকে আমরা দেখেছিলাম। মনে হয় ঐ আলোর মধ্যে এক ধরনের চুম্বকের মতন ব্যাপার আছে, সেই জন্য যে যে ঐ আলো দেখেছে, তারা নিজেদের দেখলেই চিনতে পারে!

স্বপন বলল,—কিন্তু প্রথম চক্রধারীবাবু তো ঝাড়গ্রামে সেই ডাক্তারের বাড়িতে আমাদের দেখে সবুজ আলো বলে চেঁচিয়ে ওঠেন নি।

উনি বয়স্ক লোক, গায়ে আর মনেও জোর বেশি, উনি তখন বোধহয় সেই চুম্বকের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছিলেন।

বিমান জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, স্বপন, তুই যখন অদৃশ্য হয়ে গেলি, তখন তোকে নিশ্চয়ই ওরা ওদের রকেটে তুলে নিয়েছিল। তাই না? সেখানে কী হলো রে?

স্বপন বলল,—সে-সব কথা একদমই মনে নেই। একেবারে অন্ধকার।

প্রিয়ব্রত বলল,—সেটা ওরা তো স্মৃতি থেকে মুছে দেবেই। ওদের রকেটের ভেতরের ব্যাপার আমাদের জানতে দেবে কেন?

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল ওরা।

তারপর প্রিয়ব্রত আকাশের দিকে চেয়ে বলল,—আজ আকাশ কেমন পরিষ্কার। কত গ্রহ-নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে। হয়তো ওর মধ্যে কোনো একটা থেকে এসেছিল ওরা! হয়তো সেখানে ঠিক আমাদের মতন চেহারার আর একজন করে মানুষ এখন রয়েছে, ওরা তাদের নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে। আর একটা প্রিয়ব্রত, আর একটা বিমান, স্বপন, চক্রধারী, সীতা.....

বিমান বলল,—যাই বল প্রিয়দা, এখনও বিশ্বাস হয় না। সবই যেন স্বপ্ন।
হঠাৎ স্বপন জোরে চেঁচিয়ে উঠল—প্রিয়দা, ঐ দ্যাখো আবার সবুজ আলো, ঐ যে পার্কের কোণে—
প্রিয়ব্রত চমকে সেদিকে তাকিয়ে একটু দেখে নিয়ে বলল, দূর বোকা! ওটা তো রাস্তায় ট্র্যাফিকের সবুজ আলো। এই দ্যাখ, আবার লাল হয়ে গেল। তুই কি সবুজ আলো দেখলেই ভয় পাচ্ছিস নাকি স্বপন?
বিমান হেসে উঠল হো-হো করে।

গল্প

মহাকালের লিখন

সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে কাকাবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, এ কী! এগুলো কিসের ডিম?

সন্তুও বেশ অবাক হয়েছিল। ডাক বাংলোর কুক তাদের দুজনের জন্য একটা প্লেটে চারটে ডিম সেদ্ধ দিয়ে গেছে। ওরকম ডিম সন্তু কক্ষনও আগে দেখে নি। মুর্গির ডিমের চেয়েও একটু ছোট, পুরোপুরি গোল। ঠিক পিং পং বলের মতন। প্লেটে সাজানো যেন অবিকল চারটি বল,এক্ষুনি ওগুলো নিয়ে টেবিল টেনিস খেলা যায়।

বিমান আগেই ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসেছে। সে শুধু এক কাপ চা নিয়ে বসেছে খানিকটা দূরে।

বিমান হাসতে হাসতে বলল , কাকাবাবু, আপনি চিনতে পারলেন না?

বাংলোর কুকটি বাঙালী। সে একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলল, স্যার, এখানে হাঁসের ডিম তো পাওয়াই যায় না। মুর্গির ডিম চালান আসে, তাও মাঝে মাঝে কম পড়ে যায়। কিন্তু কচ্ছপের ডিম পাওয়া যায় যথেষ্ট।

কাকাবাবু বললেন, ছি ছি ছি ছি!

বিমান বলল , খেতে কিন্তু খারাপ নয়। আপনারা খেয়ে দেখুন! আমি বলছি ভালো লাগবে।

কাকাবাবু বললেন, তুমি আমাকে কচ্ছপের ডিম চেনাচ্ছ? এক সময় কত কচ্ছপের ডিম খেয়েছি। কচ্ছপের মাংস খেয়েছি। এক একটা কচ্ছপ মারলে তার পেটের মধ্যে চোদ্দ পনেরোটা ডিমও পাওয়া যেত। এগুলো সরিয়ে নিয়ে যাও! আমরা খাব না।

বিমান বলল , এক সময় খেতেন, এখন খাবেন না কেন? আপনার আর সহ্য হয় না? তা হলে সন্তু খেয়ে নিক।

কাকাবাবু বললেন, না, সন্তুও খাবে না। তোমরা জান না, কচ্ছপ মারা নিষেধ? সারা পৃথিবীতেই কচ্ছপের সংখ্যা খুব কমে যাচ্ছে। আর কিছুদিন পর কচ্ছপ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। শুধু শুধু এই ভাবে কচ্ছপের ডিম নষ্ট করার কোনো মানে হয়?

বিমান বলল , তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু এগুলো তো সেদ্ধই হয়ে গেছে। এগুলো খেয়ে নিন। এগুলো থেকে তো আর বাচ্চা বেরুবে না!

কাকাবাবু বললেন, তবু খাওয়া উচিত নয়। তুমি যদি ভাবো এই ডিমগুলো তো

আমি নিয়ে আসিনি, আমি সেদ্ধও করিনি, সুতরাং আমার খেতে দোষ কী? তা হলে অন্য লোক আরও বেশি করে এই ডিম ধরবে, বাজারে এনে বিক্রি করবে। সেইজন্য একদম খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। ডিম নিয়ে যাও, আমরা শুধু টোস্ট আর চা খাব!

বাংলোর কুকটি বলল, আপনি বললেন, স্যার, কচ্ছপ কমে যাচ্ছে। এদিকে কিন্তু অনেক কচ্ছপ পাওয়া যায়। ওরা সমুদ্রে থাকে, কিন্তু ডিম পাড়বার সময় ওপরে উঠে আসে। মাটি খুঁড়ে সামান্য একটু গর্ত খুঁড়ে ডিম পাড়ে, তারপর আবার মাটি চাপা দিয়ে চলে যায়। লোকেরা সেই মাটি খোঁড়া দেখলেই চিনতে পারে।

কাকাবাবু বললেন, লোকেরা অমনি সেই ডিমগুলো চুরি করে আনে, তাই তো! এখন যতই কচ্ছপ থাক, এই ভাবে ডিম নষ্ট হলে একদিন কচ্ছপের বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে না? পৃথিবীর কত প্রাণী এই ভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে!

বিমান বলল, কচ্ছপ মারাও যে খুব সোজা। একবার ধরে উল্টে দিতে পারলেই হলো। ওরা নিজে থেকে সোজা হতে পারে না।

কাকাবাবু বললেন, নিরীহ প্রাণী বলেই এক সময় সাহেবরা হাজার হাজার কচ্ছপ মেরে ফেলেছে। ভারত মহাসাগরে এমন অনেক দ্বীপ ছিল যেখানে লক্ষ লক্ষ কচ্ছপের বাসা ছিল। এক একটা দ্বীপে যখন সাহেবদের জাহাজ নেমেছে, তখন খেলার ছলে তারা যত ইচ্ছে কচ্ছপ মেরেছে!

বিমান বলল, সাহেবরা তো সর্বভুক। কচ্ছপের মাংসও নিশ্চয়ই ওরা খায়!

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, টারট্‌ল সুপ তো অনেকের প্রিয়। কিন্তু শুধু খাবার জন্য নয়। বললাম না, খেলার জন্যও মেরেছে? এক দিনে কি হাজার হাজার কচ্ছপ খাওয়া যায়? মজা করার জন্য জাহাজের খালাসীরা কচ্ছপগুলোকে ধরে ধরে উল্টে দিত। কে কটা পারে তার প্রতিযোগিতা হতো। তারপর ওরা জাহাজ নিয়ে চলে যেত। দিনের পর দিন হাজার হাজার কচ্ছপ অসহায় ভাবে চিৎ হয়ে পড়ে থাকত। দৃশ্যটা ভাবো তো! তারপর তারা আস্তে আস্তে শুকিয়ে মরে যেত!

সন্তু বলল, ইস!

বিমান বলল, চলুন, কাকাবাবু, এবার আমাদের বেরুতে হবে!

কাকাবাবু চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ডাইনিং রুম ছেড়ে সবাই চলে এল বাইরে। একটা ঝকঝকে নতুন জিপসি গাড়ি অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। উর্দি পরা ড্রাইভার দরজা খুলে দিল।

কাকাবাবু জোরে একবার শ্বাস টেনে বললেন, আঃ, এখানকার বাতাস কি পরিষ্কার! চমৎকার টাটকা গন্ধ। এইটুকু রাস্তা আর গাড়িতে গিয়ে কী করব। চলো, হেঁটেই যাই!

বিমান বলল, হাঁটতে অসুবিধে হবে না আপনার?

কাকাবাবু হেসে বললেন, না হে, এই ক্রাচ নিয়েই আমি মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারি। চলো, চলো!

রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্রের দিকে। একেবারে লেখার কালির মতন ঘন নীল জল। রয়াল ব্লু! খুব কাছেই একটা দ্বীপ। সবুজ গাছপালায় এমন ভর্তি যে এখান থেকে মনে হলো এক ইঞ্চিও জায়গা খালি নেই। এমন নিবিড় জঙ্গল সন্তু আর কোথাও দেখেনি।

সন্তু এই দ্বিতীয়বার এসেছে আন্দামানে। পোর্ট ব্লেয়ার শহরটা তার বেশ চেনা লাগছে। মনটা বেশ খুশি খুশি লাগছে তার। এখানকার সমুদ্র অন্য রকম, দীঘা কিংবা পুরীর সঙ্গে কোনো মিল নেই। তীরের কাছে জল একটুও ঘোলা নয়, একেবারে স্বচ্ছ, একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই মাছের ঝাঁক দেখা যায়।

মটোর লঞ্চটাও রেডি হয়ে আছে। ওপরের ডেকের রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এর মালিক রূপেন মিত্র। কাকাবাবুদের দেখে দু'হাত জুড়ে নমস্কার করে বললেন, আসুন, আসুন, মিঃ রায়চৌধুরী। আমরা ঠিক ন'টার সময় স্টার্ট করব।

লঞ্চটা মাঝারি আকারের। নীচে চারখানা ক্যাবিন, অনায়াসে আটজন লোক শুতে পারে। রান্না-বান্নার ব্যবস্থাও আছে। এক সঙ্গে বেশ কয়েকদিন সমুদ্রের বুকে ঘুরে বেড়ানো যায়। রূপেনবাবুদের ঝিনুক আর মাদার অফ পার্ল-এর ব্যবসা। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি সমুদ্রে ঝিনুকের অন্ত নেই। কত রকম ঝিনুক, মাঝে মাঝে শঙ্খও উঠে আসে। মাদার অফ পার্ল দিয়ে মেয়েদের গয়নার লকেট হয়।

এবার অবশ্য এই লঞ্চে ঝিনুক তুলতে যাওয়া হচ্ছে না।

বিমান একজন বিমান-চালক। তার নামের সঙ্গে কাজের খুব মিল। সে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের পাইলট, মাঝে মাঝেই তাকে আন্দামানে আসতে হয়। রূপেন মিত্তিরদের সঙ্গে তার খুব ভাব। বিমানই কাকাবাবুদের এখানে বেড়াতে আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

ওপরের ডেকে কয়েকটা চেয়ার পাতা আছে,সবাই বসল সেখানে। লঞ্চটা বন্দর ছেড়ে ছুটে চলল গভীর সমুদ্রে। পাশ দিয়ে মাঝে মাঝেই অন্য লঞ্চ যাচ্ছে, সেগুলোতে যাত্রী ভর্তি। এখানে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যেতে হলে লঞ্চ ছাড়া উপায় নেই।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কোন্ দিকে যাব?

রূপেনবাবু বললেন, আমরা যাব রঙ্গত আয়ল্যান্ডের দিকে। পথে অবশ্য আরও অনেক দ্বীপ পড়বে।

বিমান বলল, এখানে কত যে দ্বীপ। অনেক দ্বীপের কোনো নামই নেই। কাকাবাবু, আপনি তো জানেন, আপনি এদিকটা ভালো করে ঘুরেছেন?

কাকাবাবু দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

বিমান আবার বলল, জানেন, রূপেনবাবু, একবার কাকাবাবু আর সন্তু একেবারে হিংস্র জারোয়াদের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন।

রূপেনবাবু বললেন, তাই নাকি? যে দ্বীপটায় জারোয়া উপজাতি থাকে, আমরা তো সেটা এড়িয়ে চলি। কাছেই যাই না। আপনি গেলেন কী করে? ওরা আপনাদের
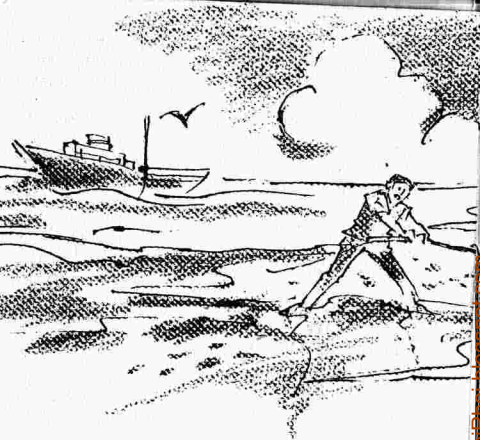
মেরে ফেলার চেষ্টা করে নি?

কাকাবাবু মৃদু হেসে বললেন, সে এক লম্বা গল্প। এখন সে কথা থাক। আচ্ছা রূপেনবাবু, আপনি কি নিজের চোখে মারমেড দেখেছেন?

রূপেনবাবু বললেন, না, আমি দেখি নি। আমি লঞ্চে করে এখানকার সমুদ্রে অনেক ঘুরেছি। বড় বড় তিমি দেখেছি। হাঙরের ঝাঁক তো যখন তখন দেখতে পাওয়া যায়। ফ্লাইং ফিস দেখেছি। ডলফিনও দেখেছি। কিন্তু মারমেড জাতীয় কিছু কখনও আমার চোখে পড়ে নি।

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে বললেন, বিমান যে বলল, আপনি দেখেছেন? মারমেড দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তো বিমান আমাদের এখানে টেনে আনল।

বিমান বলল, রূপেনবাবু নিজের চোখে দেখেছেন, সে কথা আমি বলি নি। আমি বলেছি যে রূপেনবাবুর লোকজনেরা দেখেছে!

রূপেনবাবু বললেন, হ্যাঁ, আমার লঞ্চের দু'জন খালাসী নাকি দেখেছে। মাস খানেক ধরে এখানে একটা গুজব রটেছে যে একটা মারমেড বা জলকন্যাকে নাকি মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। কোনো নির্জন দ্বীপের ধারে বালির ওপর সে বসে থাকে।
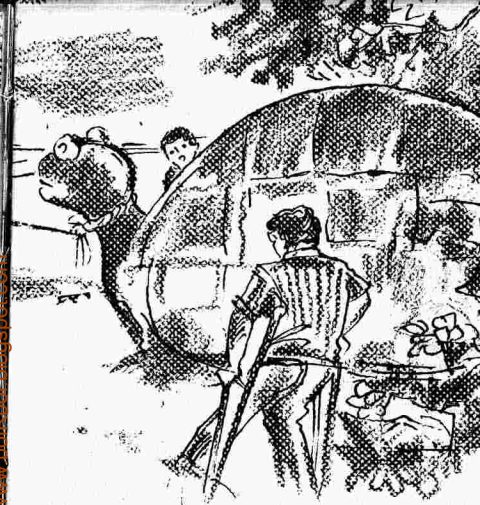
মানুষের সামান্য সাড়াশব্দ পেলেই চোখের নিমেষে জলে ঝাঁপ দেয়, তারপর গভীর সমুদ্রে মিলিয়ে যায়। রঙ্গত আর মায়া বন্দরের বেশ কয়েকজন লোকই নাকি দেখতে পেয়েছে তাকে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এটা বিশ্বাস করেন!

রূপেনবাবু বললেন, আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের কিছু নেই। নিজের চোখে তো দেখি নি!

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, যারা দেখেছে, তারা মারমেডটিকে কেমন দেখতে বলেছে?

রূপেনবাবু বললেন, ওপরের দিকটা একটা সুন্দরী মেয়ে, লম্বা চুল, ফর্সা রং, টানা

টানা চোখ। তার তলার দিকটা মাছের মতন। দুটো পা নেই, তার বদলে লেজ যেমন হয়।

কাকাবাবু বললেন, সবাই এই রকমই বলে। কোপেনহ্যাগেন শহরে এই রকম একটি মারমেডের মূর্তিও আছে।

বিমান বলল, সেটা তো বিখ্যাত। আমি দেখেছি।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, মূর্তিটা তুমি দেখেছ। কিন্তু আসল মারমেড এ পর্যন্ত কোনো মানুষ চোখে দেখে নি!

বিমান বলল, অ্যাঁ? কেউ দেখেনি? তবে যে বহুকাল ধরে এত গল্প।

কাকাবাবু বললেন, সবই গল্প। মানুষের কল্পনা কোনো প্রমাণ নেই। মাঝে মাঝে গুজব ওঠে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ ছবি তুলতে পারে নি!

সন্তু বলল, আমি ক্যামেরা এনেছি। সত্যি যদি একটা মারমেড দেখতে পাই, তা হলে পটাপট ছবি তুলব। তা হলে সেটা একটা বিরাট আবিষ্কার হবে তাই না?

কাকাবাবু বললেন, তা হবে। কিন্তু বেশি আশা করিস না। বেশি আশা করলে বেশি নিরাশ হতে হয়। সমুদ্রে ওরকম কোনো প্রাণী থাকতে পারে না!

বিমান অবিশ্বাসের সুরে বলল, থাকতে পারে না? এ কথা কী করে বললেন? সমুদ্রে এখনও কত রকম রহস্যময় প্রাণী আছে, মানুষ কি সব জানে?

কাকাবাবু বললেন, রহস্যময় প্রাণী থাকতে পারে। কিন্তু যে-প্রাণীর ওপরের দিকটা মানুষের মতন, তার হার্ট আর লাংসও তো মানুষের মতন হবে। সে বেশিক্ষণ জলে ডুবে থাকবে কী করে? তবে, অন্য দুটি প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের দেখে অনেকে মানুষ বলে ভুল করে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, মানুষের মতন প্রাণী?

কাকাবাবু বললেন, মোটেই মানুষের মতন নয়। একেবারে জলজন্তু, একটির নাম মানাটি আর একটির নাম ডুগং। এরা বিরাট বিরাট প্রাণী। এক একটির ওজন প্রায় এক টন। তিমি মাছ যেমন জলের ওপর মুখ ভাসিয়ে নিঃশ্বাস নেয়, তেমনি মানাটি আর ডুগং-রাও প্রায়ই জলের ওপর মুখখানা ভাসিয়ে থাকে। বহুকাল ধরেই গভীর সমুদ্রে নাবিকরা এদের দেখেছে। এদের মুখের সঙ্গে মানুষের কিছুটা মিল আছে!

একটু থেমে, অনেকখানি চওড়া করে হেসে কাকাবাবু আবার বললেন, মেয়েরা তো জাহাজের নাবিক হয় না। নাবিকরা সবাই পুরুষ। সেই জন্য মানুষের মুখের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে এমন প্রাণী দেখেই নাবিকরা তাকে কোনো মেয়ে বলে মনে করে। সেই থেকেই জলকন্যার কাহিনী চালু হয়েছে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, ঐ মানাটি আর ডুগংদের কেমন দেখতে?

কাকাবাবু বললেন, আমি নিজের চোখে দেখিনি, ছবি দেখেছি। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক দেখে লিখেছেন যে ওদের মুখ বিচ্ছিরি, রাগী বুড়োর মতন। সাধারণ মানুষের মুখের চেয়ে অনেকটা বড়! এদের তলার দিকটা মাছের মতন। কিন্তু এরা মাছ নয়। ম্যামাল। অর্থাৎ স্তন্যপায়ী প্রাণী, শিরদাঁড়া আছে।

বিমান বলল, দূর ছাই!

কাকাবাবু বললেন, আমি মারমেড দেখার আশা করি নি। তবে একটা মানাটি কিংবা ডুগং যদি দেখতে পাই, সেটাই যথেষ্ট। এদিককার সমুদ্রে সাধারণত ওদের দেখা পাওয়া যায় না।

রূপেনবাবু বললেন, আমার খালাসী দু'জন কিন্তু জোর দিয়ে বলেছে, ওরা একটা মেয়ের মতন প্রাণীকেই দেখেছে। আমাদের আজ ঠিক দেখাবে।

কাকাবাবু বললেন, ভালো কথা!

এরপর কফি এল। কফি খেতে খেতে ওরা তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে। নির্জন, সুন্দর সুন্দর দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছে লঞ্চটা। মাঝে মাঝে বড় বড় ঢেউতে লাফিয়ে লাফিয়েও উঠছে। জল ছিটকে আসছে ওপরের ডেক পর্যন্ত। কাকাবাবু, সন্তু, বিমান তিনজনই প্যান্ট-শার্ট পরা। কিন্তু রূপেনবাবু বনেদী বাঙালীদের মতন পরে আছেন কুচোনো ধুতি আর ধপধপে সাদা পাঞ্জাবি। একবার জলের ছিটেয় তাঁর পাঞ্জাবি অনেকটা ভিজে গেল।

কাকাবাবু একটা বায়নোকুলার এনেছেন। সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অন্যরাও দেখছে।

এক সময় সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, ঐ যে, ঐ যে!

সবাই চমকে ঘুরে তাকাল।

না, জলকন্যাও নয়, মানাটি কিংবা ডুগং-ও নয়, এক ঝাঁক উড়ুক্কু মাছ। ফ্লাইং ফিস! পার্শের মতন সাইজ, দু'পাশে ডানা, মাছগুলো জল থেকে লাফিয়ে উঠে ফর ফর ফর ফর করে বেশ খানিকটা উড়ে আবার জলে ডুব দিল।

কাকাবাবু বললেন, এও তো একটা বেশ ভালো জিনিস দেখলি রে সন্তু!

এর পর আরও তিন ঘণ্টার মধ্যে আর কিছু দেখা গেল না।

সমুদ্র যতই সুন্দর হোক, বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে একঘেয়ে লাগে। লঞ্চের ভট ভট ভট ভট শব্দটাও বিরক্তিকর। যদিও বেশ হাওয়া দিচ্ছে। কিন্তু মাথার ওপর গনগন করছে সূর্য। গরম না লাগলেও চোখ ঝলসে যাচ্ছে যেন।

এক সময় লঞ্চটা হঠাৎ থেমে গেল।

রূপেনবাবু নীচের একটা ক্যাবিনে গিয়েছিলেন পাঞ্জাবিটা পাল্টাতে। ওপরে এসে বললেন, আমার খালাসীরা একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছে। কাছেই ঐ যে দ্বীপটা দেখছেন, ওর ধারেই নাকি দু'বার দেখা গেছে মারমেডকে। এখানে অপেক্ষা করলে তার দেখা মিলতেও পারে। কিন্তু লঞ্চের শব্দ শুনলেই সে পালাবে। একটা নৌকো করে আমরা ঐ দ্বীপটায় গিয়ে অপেক্ষা করতে পারি! দুপুরের খাবারেরও তো সময় হয়েছে। ওখানে গিয়েই আমরা খেয়ে নেব।

কাকাবাবু বললেন, চমৎকার আইডিয়া! জলকন্যা কিংবা বিরাট কোনো জলজন্তু দেখা যাক বা না যাক, নতুন একটা দ্বীপে পিকনিক তো হবে! সেটাই হোক!

বিমান সভয়ে বলল, এই দ্বীপে আবার জারোয়ারা থাকে না তো?

রূপেনবাবু বললেন, না, না। দেখছ না, ছোট্ট দ্বীপ। চার পাশটাই তো দেখা

যাচ্ছে। আন্দামানের জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুক থাকে না। নির্ভয়ে ঘোরা যায়!

সন্তু জিজ্ঞেস করল, এই দ্বীপটার নাম কী?

রূপেনবাবু বললেন, তা তো জানি না। বোধ হয় কোনো নাম নেই। এখানকার অনেক দ্বীপ শুধু নম্বর দিয়ে চেনানো হয়।

সন্তু বলল, আমি এই দ্বীপটার নাম দিলাম মারমেড আয়ল্যান্ড!

লঞ্চের গায়েই বাঁধা রয়েছে একটা ডিঙ্গি নৌকো। সেটা ভাসান হলো জলে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল ছোট দ্বীপটায়।

দ্বীপটা একেবারে সুন্দর আঁকা একটা ছবির মতন। তীরের কাছে মিহি, সাদা বালি ছড়ানো। তারপর নানান রঙের নুড়ি পাথর। তারপর গাছপালা। তবে এখানকার জঙ্গল খুব ঘন নয়। বোধ হয় কখনও কখনও সমুদ্র ফুলে উঠে পুরো দ্বীপটা ডুবিয়ে দেয়। ঘাস কিংবা ঝোপ ঝাড় কিছু নেই। বড় বড় গাছ আর মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা।

তীর থেকে খানিকটা ভেতরে চলে এসে সন্তু দেখতে পেল একটা গোল মতন পাথরের ঢিবি। জুতো খুলে সন্তু তর তর করে সেটার ওপরে উঠে গেল।

তারপর আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, এই জায়গাটায় সবাই মিলে বসলে খুব ভালো হয়। এখান থেকে সব দিকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে!

কাকাবাবু পাথরটার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, বেশ পেছল! আমি আর খোঁড়া পা নিয়ে ওপরে উঠব না!

বিমানও জুতো খুলে উঠে গেল ওপরে। ঢিবিটা একতলা সমান উঁচু। এখানে খুব বড় গাছ নেই বলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বিমান বলল, বাঃ, এরকম জায়গায় একটা বাড়ি বানাতে পারলে গ্র্যান্ড হতো। বেশ নিজস্ব একটা দ্বীপ। তাতে একটাই বাড়ি থাকবে!

কাকাবাবু বললেন, আমি সমুদ্রের ধার দিয়ে দ্বীপের চারপাশটা এবার ঘুরে আসি!

কাকাবাবু আড়ালে চলে যেতেই বিমান একটা সিগারেট ধরাল। কাকাবাবুর সামনে সে সিগারেট খায় না কক্ষনও।

ছোট নৌকোটা লঞ্চের দিকে ফিরে যাচ্ছে খাবার-দাবার আনতে। লঞ্চটা স্টার্ট বন্ধ করে দিয়েছে, এখন ভাসতে ভাসতে এদিকেই যেন সরে আসছে।

সন্তু আর বিমান গল্প করছে, হঠাৎ চমকে উঠল দু'জনেই।

পাথরটা একবার কেঁপে উঠল না? মাটি কাঁপছে?

ওরা পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, কোনো কথা বলবার আগেই আবার পাথরটা কেঁপে উঠল বেশ জোরে।

এবার বিমান চিৎকার করে উঠল, ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!

সন্তুও সড়াৎ করে পাথরটা থেকে গড়িয়ে নেমে চেঁচিয়ে বলল, কাকাবাবু, সাবধান! ভূমিকম্প হচ্ছে!

সন্তুর ধারণা হলো, ভূমিকম্পে দ্বীপটার মাঝখানটা ফেটে দু'ভাগ হয়ে যাবে,

তারপর সব সুদ্ধু ডুবে যাবে সমুদ্রে।

কাকাবাবু জলের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পিছিয়ে এলেন খানিকটা। সন্তু আর বিমান দু'জনেই চ্যাঁচাচ্ছে, তিনি ওদের কাছে এসে বললেন, কী হয়েছে? কোথায় ভূমিকম্প? আমি তো কিছু টের পেলাম না!

রূপেনবাবু এসে বললেন, আমিও তো বুঝতে পারি নি।

বিমান বলল , পাথরটা দু'বার জোরে কেঁপে উঠল !

সঙ্গে সঙ্গে সন্তু চোখ বড় বড় করে সাঙ্ঘাতিক বিস্ময়ে বলল, একী! একী!

ওদের চোখের সামনে পাথরের ঢিবিটা দুলতে শুরু করেছে। আর একটু একটু এগোচ্ছে। ঠিক জীবন্ত কোনো প্রাণীর মতন।

ভয় পেয়ে সবাই ছিটকে দূরে সরে গেল।

বিমান বলল, ওরে বাপ রে, এটা কোন বিরাট জন্তু?

রূপেনবাবু এক দৌড় মেরে জলের ধারে গিয়ে তাঁর খালাসীদের ডেকে বলতে লাগলেন, ওরে রঘু, ওহে রতন, মানসিং, শিগগির লঞ্চটা নিয়ে এসো। প্রকাণ্ড জানোয়ার! মেরে ফেলবে। মেরে ফেলবে।

পাথরের ঢিবির মতন প্রাণীটা কিন্তু একটু একটু নড়তে লাগল শুধু। ওদের দিকে তেড়ে এল না।

কাকাবাবু সাহস করে একটু এগিয়ে এসে একটা ক্রাচ দিয়ে পাথরটার গায়ে একটু ঘষে দিলেন। সেটার ওপরে শ্যাওলা জমে আছে, একটুখানি খসে গেল।

কাকাবাবু বললেন, এটা তো মনে হচ্ছে একটা কচ্ছপ!

বিমান বলল, অ্যাঁ? এতবড় কচ্ছপ? তা কখনও হতে পারে?

কাকাবাবু বললেন, দাঁড়াও দেখি, কচ্ছপ হলে নিশ্চয়ই একটা মুখ থাকবে। মুখটা দেখলেই বোঝা যাবে!

কাকাবাবু প্রাণীটার চারপাশে ঘুরতে লাগলেন। বেশি খুঁজতে হলো না। একটা গাছের আড়াল থেকে ঝটাং করে বেরিয়ে এল তার গলা আর মুখ। হাতির শুঁড়ের মতন মোটা। ক্রিকেট বলের সাইজের দুটো চোখ যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে।

কাকাবাবু তবু ভয় পেলেন না। তিনি বললেন, মুখটা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এটা কচ্ছপ। সমুদ্রে অনেক বড় বড় কচ্ছপ থাকে বটে, কিন্তু এত বড় কচ্ছপ যে হতে পারে, তা কখনও শুনিনি!

সন্তু বলল, কাকাবাবু, আর এগোবেন না!

কাকাবাবু বললেন, কচ্ছপ যখন, তখন ভয়ের কিছু নেই। এরা নিরীহ প্রাণী, মানুষকে তেড়ে এসে কামড়ায় না।

এর মধ্যে রূপেনবাবুর চ্যাঁচামেচি শুনে লঞ্চটা হুইশ্‌ল দিতে দিতে চলে এল এদিকে। লাঠি, লোহার রড নিয়ে নেমে এল ছ'সাতজন খালাসী। হৈ হৈ করে কাছে এসে বলল , কোন্ জানোয়ার? কোথায়? কোথায়?

এতবড় একটা কচ্ছপ দেখে তাদেরও চক্ষু ছানাবড়া। একজন বলল, একটা পাহাড়ের মতন কচ্ছপ? স্বপ্ন দেখছি না তো?

আর একজন বলল , এটাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে!

রূপেনবাবুও এখন খানিকটা ধাতস্থ হয়েছেন। তিনি এবার খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাকে পোর্ট ব্লেয়ার নিয়ে যাব। তারপর কলকাতায় নিয়ে যাব। এরকম কচ্ছপ কেউ কখনও দেখেনি। তারপর বিলেত আমেরিকায় পাঠাব। এটাকে উল্টে দাও। উল্টে পাগুলো বাঁধ।

কিন্তু এত বিরাট কচ্ছপকে উল্টে দেওয়া সহজ নাকি? কচ্ছপটা তার মুণ্ডুটা এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছে।

একজন বলল, সাবধান! কচ্ছপের মুখের কাছে গেলে কামড়ে দেবে। হাত কিংবা পা কামড়ে ধরলে মেঘ না ডাকলে ছাড়ে না। ওর মুখটাকে আগে আটকাতে হবে!

একজন একটা লোহার রড বাড়িয়ে দিল কচ্ছপটার মুখের কাছে। কচ্ছপটা সেটা সঙ্গে সঙ্গে কামড়ে ধরে, দুটো ঝটকা মারতেই রডটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল!

রূপেনবাবু দূর থেকেই এক লাফ দিয়ে বললেন, বাপরে! দাঁতের কী জোর!

রঘু নামের একজন খালাসী বলল, স্যার, আমি কচ্ছপ ধরার কায়দা জানি। একটা শক্ত নাইলনের দড়ি চাই।

একজন দড়ি আনতে ছুটে গেল। অন্য সবাই গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। এতবড় চেহারা নিয়েও কচ্ছপটা বোধহয় বেশ ভীতু প্রাণী। সে দৌড়ে পালাবারও চেষ্টা করল না, কারুকে তেড়ে কামড়াতেও এল না।

রঘু নাইলনের দড়িটা পেয়ে একটা ফাঁস তৈরি করল। তারপর সেটা ছুঁড়ে দিল কচ্ছপটার মুখের দিকে। দু'তিনবারের চেষ্টায় ফাঁসটা জড়িয়ে গেল তার গলায়। দু'জন খালাসী দু'দিক থেকে টান মারতেই সেটা আঁট হয়ে গেল। কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার চোখ দুটো দিয়ে।

সন্তু বলল, কচ্ছপটা বোধহয় খুব বুড়ো।

কাকাবাবু বললেন, শুনেছি ওরা বহুদিন বাঁচে। এর বয়েস কয়েক শো বছর হলেও আশ্চর্য কিছু নেই।

রঘু বলল , এবার সবাই মিলে হাত লাগিয়ে ওকে উল্টে দিতে হবে!

সবাই কাছে এসে হাত লাগাবার আগেই কচ্ছপটার পিঠটা কেঁপে উঠল কয়েকবার। ওর পিঠে কিছু কিছু মাটির চাপড়া ছিল, তা খসে গেল। তখন দেখা গেল, তার পিঠে অনেক হিজি বিজি দাগ।

সন্তু বললো, কাকাবাবু দেখুন, দেখুন, এই দাগগুলো। মনে হচ্ছে এক জায়গায় বাংলা অ লেখা আছে।

কাকাবাবু বললেন, ঘরের দেয়ালে জল পড়ে নোনা ধরলেও অনেক সময় এরকম মনে হয়। অ নয় রে, আ, পাশের দাগটা ঠিক আকারের মতন।

বিমান, রূপেনবাবুরাও ঝুঁকে এসেছেন দেখতে। বিমান বলল, তার পাশেই তো

র। কেউ যেন লিখেছে 'আর'।

কাকাবাবু ক্রাচ দিয়ে কচ্ছপটার পিঠটা খুব ভালো করে ঘষলেন! অনেক ময়লা সরে গেল। এবার ফুটে উঠল আরও অক্ষর! 'আর'-এর একটু পরেই 'মা'।

সন্তু বলল, তারপর এটা কি? এ? মা এ?

কাকাবাবু বললেন, এ নয় তয়ে র-ফলা। মাত্র তা হলে হলো, 'আর মাত্র'।

রূপেনবাবু বললেন, আশ্চর্য! আশ্চর্য! কচ্ছপের পিঠে এরকম লিখল কে?

কাকাবাবু গভীর বিস্ময়ে কচ্ছপের পিঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর অভিভূতভাবে বললেন, প্রকৃতি লিখে দিয়েছে! কিংবা মহাকালও বলতে পারেন। প্রবাদ আছে, মহাকূর্ম অর্থাৎ বড় কোনো কচ্ছপের পিঠে মহাকাল তার ইতিহাস লিখে রাখে!

সন্তু বলল, আরও কিছু লেখা আছে!

কাকাবাবু বললেন, আমি সবটা পড়তে পেরেছি। এই দ্যাখ ভালো করে। 'আর মাত্র দু'টি। মেরো না, মেরো না, মেরো না!'

সন্তু বললো, হ্যাঁ, স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। প্রকৃতি লিখে দিয়েছে যে পৃথিবীতে এরকম কচ্ছপ মাত্র দুটো বেঁচে আছে।

বিমান বলল, কি বলছিস। প্রকৃতি কিংবা মহাকাল বাংলায় লিখবে নাকি?

কাকাবাবু বললেন, মহাকাল কখন কোন্ ভাষায় লেখেন, তার তুমি-আমি কী জানি! কথাগুলো যে লেখা রয়েছে, তা তো সত্যি। কচ্ছপটা নিজেই পিঠ ঝাঁকিয়ে তা আমাদের দেখাল ।

তারপর হঠাৎ কাকাবাবু হাত জোড় করে আবেগের সঙ্গে খালাসীদের বললেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, ওকে ছেড়ে দিন। বন্দী অবস্থায় যদি ও মরে যায়, তা হলে পৃথিবী থেকে এই কচ্ছপ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এদের ধ্বংস করার কোনো অধিকার আমাদের নেই।

খালাসীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রূপেনবাবু বললেন, ওরে বাপ রে বাপ! জন্মে কখনও এমন দেখিনি। ভগবান নিজে লিখে দিয়েছেন ওকে মেরো না! ওকে বন্দী করলে আমাদের মহাপাপ হবে! ইনি সাক্ষাৎ কূর্ম অবতার। ওরে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, শিগগির ছেড়ে দে!

খালাসীরা এবার ফাঁস খুলে নিল ওর গলা থেকে। কাকাবাবু সবাইকে দূরে সরে যেতে বললেন। সকলে সার বেঁধে কচ্ছপটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল !

কচ্ছপ এবার থপ থপ করে এগোতে লাগল জলের দিকে।

রূপেনবাবু হাত জোড় করে বললেন, জয় বাবা কূর্ম অবতার। আমাদের দোষ নিও না!

তাঁর দেখাদেখি অন্য খালাসীরাও নমস্কার করল ।

কচ্ছপটা জলের কাছাকাছি গিয়ে একবার মুখটা ফিরিয়ে ওদের দেখল। তারপর প্রবল আলোড়ন তুলে মিলিয়ে গেল নীল সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে।

পার্বতীপুরের রাজকুমার

পার্বতীপুর স্টেশনে নেমেই সুজয়ের গাটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। দুচোখের কোণ জ্বালা করতে লাগল একটু একটু, আঙুলের ডগাও ভোঁতাভোঁতা লাগল। জুন মাসের দুপুর, গনগন করছে রোদ, তাও সুজয়ের হঠাৎ শীত লাগল। জ্বর আসবার সময়ে এই রকম হয়।

স্টেশনটা ছোটখাট, অতি সাধারণ। বাবা ট্রেন থেকে মালপত্র নামাচ্ছেন, মা আর দিদি একপাশে দাঁড়িয়ে বাক্স প্যাঁটরা গুনছে। সুজয় একটু দূরে সরে গেল। ধ্যুৎ, বেড়াতে এসে জ্বর হবার কোনো মানে হয়? মা টের পেলেই বিছানায় শুইয়ে রাখবেন।

কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে ওরা উঠল ওভারব্রীজে। মাঝামাঝি আসবার পর সুজয়ের মনে হলো ব্রীজটা কোথায় যেন ভাঙা। তক্ষুনি কুলিটি বলল, 'দেখবেন বাবু, সাবধান, সামনে দুটো কাঠ ভাঙা আছে।' সুজয় অবাক হয়ে গেল— ঐ কথাটা হঠাৎ তার মনে হলো কেন? সে তো ভাঙা জায়গাটা দেখতে পায়নি। দুখানা তক্তা নেই সেখানে, কেউ অন্যমনস্ক থাকলে গলে নীচে পড়ে যেতে পারে।

স্টেশনের বাইরে একটিমাত্র নীল রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আর কয়েকখানা সাইকেল রিক্‌শা।

বাবা বললেন, 'ঐ যে আমাদের জন্য গাড়ি পাঠিয়েছে।'

বাবার বন্ধু রঞ্জিতকাকুর মামাবাড়ি পার্বতীপুরে। রঞ্জিতকাকুর মামারা একসময়ে এখানকার জমিদার ছিলেন। এখন তো আর জমিদারি নেই, কিন্তু সেই আমলের একটা প্রকাণ্ড বাড়ি আছে। বড়বড় দুটো দিঘি আর ফলের বাগান আছে। রঞ্জিতকাকু প্রায়ই পার্বতীপুরের এই বাড়ির গল্প করতেন তাই বাবা একদিন বলেছিলেন, 'ব্যবস্থা করে দাও না, আমরা ওখানে কিছুদিন থেকে আসি।'

রঞ্জিতকাকু বলেছিলেন, 'কোনোই অসুবিধে নেই'। তাঁর এক মামা এখনও সেখানে থাকেন। অন্য মামারা থাকেন কলকাতায়, গ্রামে আর আসতে চান না। কিন্তু তাঁর মেজমামা এখানেই থাকতে ভালোবাসেন। তিনিই এ বাড়ির দেখাশুনা করেন।

রঞ্জিতকাকু তাঁর মেজমামাকে চিঠি লিখে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি নিজেও সঙ্গে আসবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু শেষ মহূর্তে আটকে গেছেন কাজে।

একটা মস্ত বড় গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে নীল রঙের গাড়িটা। সুজয় বেশির ভাগ গাছই চেনে না, কিন্তু এটা যে অশ্বত্থ গাছ তা সে চিনতে পেরেছে। পার্বতীপুর

স্টেশনের বাইরে একটা গাছ থাকবে তাও যেন সে জানতো!

সুজয়ের একই সঙ্গে শীতও করছে, গরমও লাগছে।

গাড়ি থেকে একজন লম্বা, শুকনো চেহারার লোক নেমে বিনীতভাবে হাতজোড় করে বলল, 'মেজবাবু নিজে আসতে পারেন নি। আপনাদের ট্রেনে আসতে কোনোরকম অসুবিধে হয়নি তো? দয়া করে গাড়িতে উঠে বসুন।'

লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে সুজয়ের মনে হলো লোকটা মিথ্যে কথা বলছে!

গাড়িটা স্টার্ট নেবার সময় প্রচুর শব্দ করল। এমন ফটফট দুমদাম শব্দ যেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে গাড়িটার গায় হাত বুলোচ্ছিল, তারা ঐ শব্দ শুনে দূরে সরে গেল ভয়ে।

একটুখানি পাকা রাস্তার পরই গাড়িটা নেমে পড়ল মাঠের মধ্যে। সেইখান দিয়েই চলতে লাগল ধুমধামের সঙ্গে। গাড়িটা লাফাচ্ছে যেন ঘোড়ার মতন!

ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে বলল, 'গতবছর বন্যায় এদিককার রাস্তা সব ভেঙে গেছে তো। গাড়ি চালাবার উপায় নেই।'

বাবা বললেন, 'তাহলে গাড়ি আনলেন কেন? আমরা কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে না হয় হেঁটেই যেতুম। বেশি দূর তো নয়'।

ড্রাইভার বলল, 'না বেশি দূর নয়, এই মাত্র মাইল পাঁচেক।' বাবা বললেন, 'অ্যাঁ? রঞ্জিত যে বলেছিল স্টেশনের কাছেই বাড়ি!' ড্রাইভার বলল, 'হ্যাঁ, আগে খুব কাছে ছিল, এখন যে রেল স্টেশনটা দূরে সরে গেছে!'

সুজয় বসে আছে ড্রাইভারের পাশে, তার এসব কোনো কথাই বিশ্বাস হচ্ছে না।

মিনিট দশেক যাবার পরেই গাড়িটা ক্যাঁকর কোঁ ভুররর-ভট শব্দ করে একেবারে থেমে গেল। ড্রাইভার নেমে গিয়ে, বনেট খুলে খুটখাট আরম্ভ করল।

মা বাবার দিকে ফিরে বললেন, 'আমি বলেছিলুম পুরী যেতে। শুনলে না তো আমার কথা!'

ড্রাইভার উঁকি মেরে বলল, 'উপায় নেই, ঠেলতে হবে।' সবাই নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। রোদ একেবারে ঝাঁঝাঁ করছে তবে, গতকালই বোধহয় বৃষ্টি হয়েছিল, মাঠের এখানে সেখানে জল জমে আছে। মা তো কাদার মধ্যেই পা দিয়ে ফেললেন। ড্রাইভার বলল, 'সাবধান, দেখবেন, এখানে বড্ড সাপ খোপের উপদ্রব, কালই একজনকে সাপে কেটেছে।'

দিদি তাই শুনে এক লাফ দিল।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'সাপে কেটেছে মানে সাপে কামড়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোথায়? এই মাঠে?'

'মাঠে তো সাপের কামড়ে প্রায়ই এক আধজন মরে। কাল একজন মরেছে আমাদের রাজবাড়িতেই।'

মা বললেন, 'স্টেশনটা তো বেশি কাছে। ফিরে গেলে হয় না?'

বাবা বললেন, 'আহা, আগেই অত ভয় পাচ্ছ কেন?'

মাঠের সামনে একটা উঁচু বাঁধ। গাড়িটা অনেক কষ্টে ঠেলে তোলা হলো ওপরে। সবাই দারুণভাবে হাঁপাতে লাগল। সুজয়ের শরীরটা কাঁপছে। ঠিক ম্যালেরিয়া রুগীর মতো।

ড্রাইভার বলল, 'এইবার উঠে বসুন, আর চিন্তা নেই।'

গাড়ি চলতে শুরু করল আবার। সুজয়ের মনে হলো গাড়িটা আসলে খারাপ হয় নি। লোকটি ইচ্ছে করে ঠেলাল ওদের দিয়ে। মাঠটা পার করে দিল এই ভাবে।

বাঁধের ওপরে বেশ ভালো রাস্তা। একটু বাদেই সেটা গিয়ে মিশেছে পাকা রাস্তায়। তারপর আবার মিনিট দশেক চলার পর একটা মোড় এল। রাস্তার মাঝখানটা গোল করে বাঁধান। তার সামনে, বাঁদিকে আর ডানদিকে তিনটে রাস্তা বেরিয়ে গেছে। গাড়িটা বাঁ দিকে বেঁকতেই সুজয় বলে উঠল, 'ডান দিকে।' মা, বাবা, দিদি সবাই তার দিকে তাকাল। ড্রাইভারও ঘচ করে ব্রেক কষে সুজয়ের দিকে চেয়ে রইল।

সুজয় দৃঢ়ভাবে বলল, 'এবারে ডানদিকে যেতে হবে।'

ড্রাইভারটি কাঁচুমাচু ভাবে বলল, 'হ্যাঁ, আমারই ভুল হয়ে গেছে। এদিকে তো বেশি আসা হয় না।'

পেছনের সীট থেকে দিদি মুখ ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কী করে জানলিরে?'

সুজয় কোনো উত্তর দিল না। দিদি তার ঘাড় ছুঁয়েছে। কিন্তু চমকে উঠল না তো! সুজয়ের তো এখন জ্বরে পুড়ে যাবার কথা। তবে কি তার জ্বর হয় নি?

রাস্তাটা আবার ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। সেখানে মোড় ফেরবার আগেই সুজয় আবার বলে উঠল, 'আমরা এসে গেছি।' বাবা বললেন, 'যাঃ, পাঁচ মাইল দূর বলল যে।' ড্রাইভার এবার রীতিমতন ভয়ে ভয়ে সুজয়ের দিকে চোরা চাহনি দিল।

গাড়িটা ডানদিকে ঘোরার একটু পরেই দেখা গেল গাছপালার আড়ালে একটা বিশাল বাড়ি। জমিদার বাড়িকে গ্রামের লোক রাজবাড়ি বলে। সত্যি রাজবাড়ির মতন দেখতে। সামনে প্রকাণ্ড লোহার গেট, দুপাশে দুটি গম্বুজ। গেটের পর সুরকি বিছানো পথ, তার দুদিকে নানারকম ফুলের গাছ আর পাথরের পরী। তারপর বাড়িটা যেন দুর্গের মতন।

গেট দিয়ে গাড়িটা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সুজয় বলল, 'বাবা, এই বাড়িতে আমি আগে এসেছি'।

বাবা বললেন, 'সে কি? তুই কী করে আগে আসবি এখানে? আমি নিজেই কখনও আসিনি।'

সুজয় বলল, 'এই জায়গাটা আমার খুব চেনা। এই বাড়িটাও।'

দিদি বলল, 'এরকম অনেক বাড়ি ছবিতে দেখা যায়। দেখলেই মনে হয় চেনা চেনা।'

সুজয় বলল, 'না, সেরকম নয়, এই জায়গায় আগে এসেছি।'

মা বললেন, 'আমরা কেউ আসিনি। তুই কি একা এসেছিস?'

গাড়িটা এসে থামল বাড়ির সামনে। থাক থাক সিঁড়ি উঠে গেছে। তারপর পেতলের বল্টু লাগানো একটা মস্ত বড় কাঠের দরজা। গাড়ির আওয়াজ পেয়েও কেউ বাইরে বেরিয়ে এল না।

ড্রাইভারটি সুজয়ের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল। সুজয় বলল, 'কী হলো, কাউকে দরজা খুলতে বলুন! সে চমকে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' তারপর সে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে ধাক্কা দিল দরজায়। বেশ কয়েকবার ধাক্কা দেবার পর দরজা খুলে একজন লাঠিয়াল বেরিয়ে এল।

বাবা বললেন, 'আশ্চর্য তো! লাঠিয়াল বাইরে পাহারা দেবার বদলে দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে আছে!'

লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেজবাবু কোথায়?'

লোকটি বাবার দিকে চেয়ে রইল, কোনো উত্তর দিল না।

সুজয় বলল, 'এই লোকটি বোবা!'

ড্রাইভার প্রায় আঁতকে উঠল সুজয়ের কথা শুনে। ফ্যাকাসে মুখে বলল, 'আপনি কী করে জানলেন?'

এবারে মা আর বাবা খুব অবাক হয়েছেন। দিদি বলল, 'সত্যি?'

ড্রাইভার বলল, 'হ্যাঁ, রঘু কথা বলতে পারে না। এই রঘু, মালপত্তর তোল।'

লোকটি লাঠি নামিয়ে রেখে দুহাতে দুটো সুটকেস তুলে ভেতরে চলে গেল।

ড্রাইভার বলল, 'আসুন, ওপরে চলুন।'

মা বেশ বিরক্ত হয়েছেন। বাড়িতে অতিথি এলে বাড়ির লোক কেউ অভ্যর্থনা করতে আসবে না?

রঞ্জিতবাবু অবশ্য বলেছিলেন যে তাঁর মেজমামা বিয়ে করেন নি, বাড়িতে অন্য লোক আর বিশেষ কেউ নেই।

দোতলায় অনেকগুলি ঘর তালাবন্ধ। সুজয় ড্রাইভারের আগে আগে এগিয়ে গেল। তারপর বারান্দা ঘুরেই ডানদিকের প্রথম ঘরটার দরজা ঠেলে খুলে ফেলল। যেন সে জানতো যে এই ঘরটাই তাদের জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, সুজয় এরপর বলল, 'মা, তোমাদের এই ঘর, আমি আর দিদি থাকব তিনতলায়। চল দিদি, আমাদের ঘরটা দেখে আসি।'

বাবা বললেন, 'কী ব্যাপার বল তো খোকা? তুই এসব কী বলছিস?'

সুজয় মৃদুমৃদু হাসতে লাগল, তার চোখ জ্বলজ্বল করছে, তাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

বাবা তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'এই খোকা! কী হয়েছে তোর?'

সুজয় বলল, 'কী জানি! বুঝতে পারছি না। আমার সব কিছুই মনে হচ্ছে আগে থেকে জানা। এ বাড়িতে আগে আমি থেকেছি।'

মা বললেন, 'ছেলেটা ক্ষেপে গেল নাকি? এ বাড়িতে ও আগে আসবে কী করে?'

ড্রাইভারটি অস্ফুটভাবে বলল, 'ছোটবাবু! ছোটবাবু! তারপরেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাবা তাকে ডেকে বললেন, 'এই যে, আপনি চলে যাচ্ছেন— আপনার বাবুর সঙ্গে দেখা হলো না—

'বাবুর তো শরীর খারাপ। উনি ঘর থেকে বেরুচ্ছেন না—'

'ঠিক আছে। ওঁর ঘরেই আমরা যাব।'

'উনি বলেছেন সন্ধেবেলা দেখা করবেন। আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না। ডাকলেই রঘু আসবে।'

'ঐ লোকটি তো বোবা! যারা বোবা হয়, তারা কালাও হয়।। ডাকলে ও শুনবে কী করে?'

'না না, ও শুনতে পায়। কথা বলতে পারে না। আপনারা বিশ্রাম করুন। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

মা এবারে প্রকাশ্যেই বলে ফেললেন, 'এ বাড়িতে আমার একটুও থাকতে ভালো

লাগছে না বাপু। রঞ্জিতবাবু এ কোন জায়গায় পাঠালেন আমাদের?'

'রঞ্জিত তো বলেছিল আমাদের খুব ভালো লাগবে। ওর মেজমামা আমাদের খুব খাতির করবেন। তিনি খুব আমুদে লোক।'

'কোথায়! তিনি তো একবার দেখাও করলেন না!'

'শুনছি তো অসুস্থ। রঞ্জিতের চিঠির উত্তরে তিনি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আমাদের আসতে বলেছেন।'

'তাতে তো জানান নি যে তিনি অসুস্থ! ওকি! ওকি! ছেলেটার কি হলো?'

সুজয় তখন থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। তার চোখ বুজে গেছে।

বাবা ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন, 'খোকা, খোকা, অমন করছিস কেন?'

সুজয় বলল, 'আমি ওপরে যাব।' তারপরেই সে এক দৌড় লাগাল।

'ওকি? ওকি?' বলে বাবা, মা, দিদিও ছুটলেন তার পেছন পেছন।

সুজয় দৌড়তে দৌড়তে উঠে এল তিনতলায়। সেখানে ড্রাইভার আর রঘু দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘরের দরজার সামনে। দু-জনেরই মুখ শুকনো। সুজয়কে দেখে তারা বেশ ভয় পেয়েছে।

সুজয় হুকুমের সুরে বলল, 'সরে যাও। দরজা খোলো।' ড্রাইভার হাত জোড় করে বলল, 'ছোটবাবু! ছোটবাবু! আমার কোনো দোষ নেই!'

সুজয় এক ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। একজন মাঝবয়সী লোক একটা সিল্কের ড্রেসিং গাউন পরে মাথা আঁচড়াচ্ছিল। আওয়াজ শুনে ফিরে তাকাল। লোকটির মাথায় টাক। মুখে কাঁচা-পাকা লম্বা দাড়ি।

সুজয়কে দেখে লোকটিও বেশ ভয় পেয়ে গেল। এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে যেতে যেতে বলল, 'এ কে? এ কে?' সুজয়ের বাবা-মাও ততক্ষণে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সুজয় তাঁদের দিকে ফিরে বলল, 'এই লোকটা মেজবাবু নয়। এ একটা বদমাস! আগে নায়েবের কাজ করত।'

সিল্কের জোব্বা-পরা লোকটাও ড্রাইভারের মতন বলে উঠল, 'ছোটবাবু! ছোটবাবু!'

সুজয় প্রায় লাফিয়ে গিয়ে লোকটার দাড়ি ধরে এক টান দিতেই সেই দাড়ি খুলে এল হাতে। নকল দাড়ি!

লোকটা বিকট সুরে চিৎকার করতে লাগল, 'ওরে বাবা রে! মেরে ফেললে রে!! ভূত! ভূত!! ছোটবাবু, ছেড়ে দাও আমাকে— আমি সব স্বীকার করছি।'

ড্রাইভার বলল, 'ছোটবাবু ঠিকই বলেছেন। এ মেজবাবু নয়। এ ছিল আগে এ বাড়ির নায়েব।'

রঘু আর ড্রাইভার এসে দুমদুম করে লোকটিকে ঘুঁষি মারতে লাগল। সে মাটিতে পড়ে কাৎরাতে লাগল।

এরপর আস্তে আস্তে সব জানা গেল। দিন দশেক আগে এ বাড়িতে মেজবাবু হঠাৎ মারা গেছেন। অন্য ভাইরা সবাই কলকাতায় থাকেন। তাঁরা সে খবর জানতে

পারেননি। ঐ নায়েবই ইচ্ছে করে জানায় নি। তার বদলে সে নিজেই মেজবাবু সেজে এ বাড়ি থেকে সব জিনিসপত্র সরাবার মতলবে ছিল। বাড়ির মধ্যে বাইরের লোক বিশেষ কেউ ঢোকে না। ড্রাইভার আর রঘুকে সে ভয় দেখিয়ে নিজের দলে রেখেছিল।

নায়েব লোকটি বদমাস হলেও মোটেই সাহসী ছিল না। সুজয়কে দেখেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল— পরে সব কথা নিজেই স্বীকার করল।

বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'খোকাকে দেখে তোমরা সবাই ভয় পাচ্ছিলে কেন? ছোটবাবু বলছিলে কেন?' নায়েব আর ড্রাইভার জানাল যে এ বাড়ির যিনি বড়বাবু ছিলেন তাঁর এক ছেলে ছিল ঠিক সুজয়েরই বয়সী, দেখতেও অবিকল একরকম। বছর খানেক আগে সে কলকাতা থেকে এখানে বেড়াতে এসে সাপের কামড়ে মারা যায়। সেই ঘটনার পর থেকেই বাবুরা আর এ বাড়িতে আসেন না। মেজবাবু একলাই এখানে থাকতেন। সুজয়কে দেখে আর তার কথাবার্তার ধরনে ওরা সবাই ভেবেছিল সেই ছোটবাবুই আবার ফিরে এসেছেন!

বাবা বললেন, 'কেউ মরে গেলে আবার ফিরে আসে কী করে? তোমাদের এইটুকুও বুদ্ধি নেই?'

ড্রাইভার বলল, 'ছোটবাবুকে তো পোড়ানো হয়নি। এ দেশের নিয়ম হচ্ছে, কাউকে সাপে কামড়ালে তার দেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে হয়। তাই করা হয়েছিল। লখীন্দর যেমন বেঁচে ফিরে এসেছিলেন, সেই রকম ছোটবাবুও নিশ্চয় ফিরে এসেছেন!

বাবা সুজয়ের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'যাঃ, এতো আমাদের ছেলে। এ তোমাদের ছোটবাবু হবে কী করে?'

কিন্তু সুজয় কী করে এখানকার রাস্তা ঘাট, এই বাড়ি সব আগে থেকে চিনল? কী করেই বা জানল যে রঘু বোবা আর নায়েবই মেজোবাবু সেজে আছে! কিছুই বোঝা গেল না। সুজয় নিজেও সে কথা বলতে পারল না।

সুজয়ের শরীরে আর কাঁপুনি নেই। জ্বরভাবও ছেড়ে গেছে। আগের কথা আর তার কিছুই মনে নেই!

আজব লড়াই

হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে রণজয় দেখল, তার হাত দুটো যেন কী দিয়ে বাঁধা। অথচ দড়ি বা শিকল-টিকল কিছু নেই। হাত দুটো ছড়াতে গিয়েই সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। যেন দুটো ব্লেড তার হাতের চামড়া কেটে দিচ্ছে।

তার পা দুটোরও সেই অবস্থা। সে পা ফাঁক করতে পারছে না, কিন্তু কী দিয়ে যে পা বাঁধা তাও বোঝা যাচ্ছে না। রণজয় এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, তার পাশে গুটুলি নেই, কেউ নেই। বড় মস্ত একটা শিমুল গাছের তলায় সে আগে যেমন শুয়ে ছিল, সেই রকম ভাবেই শুয়ে আছে।

অতিকষ্টে সে উঠে বসল। হাত দুটোকে মুখের কাছে এনে সে দেখল, একটা চুলের মতন সরু কোনো সুতো দিয়ে তার কব্জিদুটো বাঁধা হয়েছে, কিন্তু চুল নয়, সেই সুতোটার রং নীল, তাই তার চামড়ার মধ্যে একবারে মিশে গেছে। রণজয় আর একবার একটু টানবার চেষ্টা করেই বুঝল, এই সুতো ছেঁড়ার সাধ্য তার নেই। টানতে গেলেই তার হাতের চামড়া কেটে যাচ্ছে।

রণজয় যেই বুঝতে পারল যে সে বন্দী, অমনি তারা সারা গায়ে ঘাম এসে গেল। সাধারণ কোনো মানুষ তাকে বন্দী করতে পারে না, মোটা মোটা লোহার শিকলও রণজয় এক হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলেছে এর আগে। কিন্তু সে এই সরু সুতো ছিঁড়তে পারছে না? এত সরু আর এত শক্ত সুতো কি পৃথিবীতে পাওয়া যায়?

উঠে দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই। রণজয় চিৎকার করে ডাকল, গুটুলি! গুটুলি!

কেউ সাড়া দিল না।

গুটুলি রণজয়ের প্রিয় বন্ধু, সে কখনও রণজয়কে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে না। নিশ্চয়ই তাকেও কেউ বন্দী করে নিয়ে গেছে।

রণজয়ের দারুণ খিদে পেয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠলেই তার খিদে পায়। আর বাচ্চা বয়েসের মতন, বেশি খিদে পেলেই তার কান্না এসে যায়, যদিও তার চেহারাটা এখন রূপকথার দৈত্যের মতন।

হঠাৎ পাতার ওপর খসখস শব্দ হতেই রণজয় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। দু'জন মানুষ সমান তালে পা ফেলে হেঁটে আসছে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। তারা দু'জনে চ্যাংদোলা করে ধরে আছে একটা হরিণকে। হরিণটা বেঁচে আছে, ছটফট করছে। ওরকম একটা জ্যান্ত হরিণকে ধরে রাখা সহজ নয়, কিন্তু লোক দুটো যেন হরিণটার ছটফটানি গ্রাহ্যই করছে না।
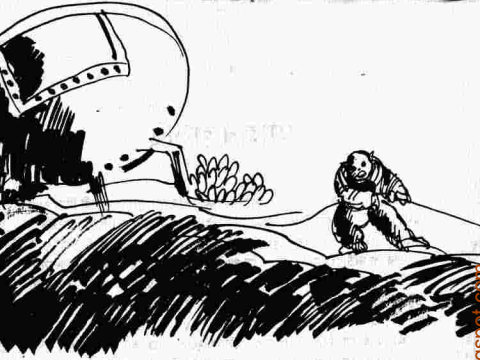
লোক দুটির গায়ের রং নীল!

রণজয়ের সব রোম খাড়া হয়ে গেল। এদের সে চিনতে পেরেছে। এরা সপ্তম গ্রহ বলয়ের প্রাণী, এরা একবার রণজয়কে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এরা আবার ফিরে এসেছে।

লোক দুটি রণজয়ের কাছে এল না, তার পেছন দিকে জঙ্গলের আড়ালে চলে গেল। একটু পরে সে দেখতে পেল একটি লোককে, তার এক হাতে একটা জ্যান্ত খরগোশ, অন্য হাতে একটা টিয়া পাখি। আশ্চর্য ব্যাপার, এরা জ্যান্ত হরিণ, খরগোশ, টিয়া পাখি ধরছে কী করে?

এই লোকটি রণজয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। এর মাথায় একটাও চুল নেই, মুখে দাড়ি-গোঁফ নেই। ভুরু নেই, চোখের পল্লবও নেই। সে কিড়মিড় করে কী যেন বলল।

রণজয় ওদের গ্রহে একবার ঘুরে এলেও ওদের ভাষা বোঝে না। ওদের দু'একজনের কাছে একটা যন্ত্র থাকে, সেটা হাতে নিলে মনে মনে কথা বললেও বোঝা যায়।

লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে অবশ্য বোঝা গেল, সে রণজয়কে তার সঙ্গে যেতে বলছে। কিন্তু রণজয় তো উঠে দাঁড়াতেই পারছে না।

লোকটি দু'বার ধমক দেবার পর রণজয়ের আরও কাছে এসে তার কোলের ওপর একটা পা দিয়ে দাঁড়াল। লোকটির পায়ের জুতো দেখলে মনে হয় স্টিলের তৈরি,

কিন্তু রবারের মতন নরম।

হাত খোলা থাকলে রণজয় একটা থাপ্পড় দিয়ে লোকটাকে শত হাত দূরে পাঠিয়ে দিতে পারত। এত সাহস যে রণজয়ের গায়ে পা দেয়!

লোকটি রণজয়ের হাত বাঁধা সুতোটার একটা দিক খুঁজে নিল। তারপর সেটা ধরে টানতেই রণজয় আবার ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। লোকটি তা গ্রাহ্য না করেই সেই সুতোটা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল রণজয়কে। রণজয় মাটিতে গড়াতে লাগল, মাঝে মাঝে পাথর আর গাছের ডালপালায় তার সারা গা ছড়ে গেল, কিন্তু তার বাধা দেবার কোনো উপায় নেই।

জঙ্গলটা যেখানে বেশ ঘন, সেখানে রয়েছে সেই গোল চকচকে একটা আকাশযান। এই রকেটটা রণজয় চেনে। ঠিক এই রকম রকেটে করেই নীল মানুষরা একবার তাকে নিয়ে গিয়েছিল মহাশূন্যে। আবার তাকে সেখানে যেতে হবে? তাহলে আর কি কোনোদিন ফেরা যাবে?

লোকটি সামনে এসে দাঁড়াতেই গোল রকেটের একটা গোল দরজা খুলে গেল। রণজয়ের মনে পড়ল, ওরা যে গ্রহে থাকে, সেখানে সবকিছুই গোল গোল।

দরজাটা খুলতেই লোকটা টিয়া পাখি আর খরগোশটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল ভেতরে। তারপর রণজয়ের দিকে তাকাল।

রণজয়ের হাতের চামড়া কেটে রক্ত পড়ছে। সে বুঝতে পারল, বাধা দিয়ে কোনো

লাভ নেই, তাতে শুধু তার কষ্টই বাড়বে। সে নিজেই ঢুকে পড়ল রকেটটার মধ্যে।

ভেতরটা যেন একটা চিড়িয়াখানা!

সেখানে একটা করে গরু, ঘোড়া, মোষ, হরিণ, নানা রকমের পাখি, একটা চিতাবাঘ, কয়েকটা সাপ, ব্যাঙ, ছাগল, প্রজাপতি, ফড়িং এইসব জন্তু-জানোয়ার, পোকা-মাকড়ে ভর্তি।

একটা পাতলা ধোঁয়ায় ভরে আছে ভেতরটা, তাতে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। সেই ধোঁয়ার জন্যই বোধহয় জন্তু-জানোয়ারগুলো সবাই এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে, কেউ ছটফট করছে না।

এক কোণে বসে আছে গুটুলি। সে অজ্ঞান হয়ে যায়নি, কিন্তু রণজয়কে দেখেও কোনো কথা বলল না, শুধু তার চোখ দুটো বড় হয়ে গেল।

যে-লোকটি রণজয়কে টেনে এনেছিল, সে এবার রণজয়ের হাত ও পায়ের সুতোর বাঁধন খুলে দিল। তারপর ধমক দিয়ে কী যেন বলল!

রাগে রণজয়ের পিত্তি জ্বলে গেল! এই লোকগুলো পৃথিবী থেকে নানারকম জন্তু-জানোয়ারের স্যাম্পেল নিয়ে যেতে এসেছে নিজেদের গ্রহে। তা বলে কি তারা মানুষও ধরে নিয়ে যাবে? পৃথিবীর মানুষকেও এরা জন্তু মনে করে?

এই লোকগুলো কেউই রণজয়ের মতন লম্বা নয়। কিন্তু রণজয় জানে যে, এদের মধ্যে কে যে রক্তমাংসের প্রাণী আর কে যে যন্ত্র-মানুষ, তা বোঝবার উপায় নেই। এই যন্ত্র-মানুষরাও একরকম নরম ধাতু দিয়ে তৈরি, তাই এদের হাত-পা মানুষের মতনই মনে হয়। কিন্তু এদের গায়ে অসম্ভব শক্তি।

একটি মেয়ে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। তার হাতে একটি ছোট্ট গোল রেডিওর মতন যন্ত্র। সেই যন্ত্রটা মুখের কাছে এনে সে কিছু বলল। রণজয় এবার পরিষ্কার বাংলায় শুনতে পেল, "এই যে পলাতক। আবার আমাদের দেখা হলো, আমায় চিনতে পারো?"

রণজয় মেয়েটাকে চিনতে পেরেছে। মহাকাশের বহুদূরে, সৌরলোক থেকে কোটি কোটি মাইল পেরিয়ে, এদের নীল রঙের গ্রহে রণজয় একসময় বন্দী ছিল। সেই সময় এই মেয়েটিই পাহারা দিত তাকে। ওদের গ্রহে ছেলেরা আর মেয়েরা সমান কাজ করে। এই মেয়েটির চোখে ধুলো দিয়েই রণজয় কোনো রকমে পালাতে পেরেছিল।

রণজয় বলল, "আমাকে পলাতক বলছ কেন? আমি তো এই পৃথিবীরই মানুষ! তোমরা আমাকে বন্দী করেছিলে, আমি আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছি।"

মেয়েটি হেসে বলল, "তুমি আর পৃথিবীর মানুষ নও! নিজের চেহারা কি তুমি দেখতে পাও না? তোমার গায়ের রং নীল! তুমি কত লম্বা! পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে তোমার কোনো মিল নেই আর। তুমি আমাদেরই একজন হয়ে গেছ। তুমি আমাদের সঙ্গে চলো, আমাদের গ্রহে থাকবে। সেখানে তোমাকে কত আদর-যত্ন করব।"

রণজয় বলল, "আমার চেহারাটা বদলে গেলেও আমার মনটা রয়ে গেছে

মানুষের মতন। আমি এই পৃথিবীকেই ভালোবাসি। আমার দেশকে ভালোবাসি। এই পৃথিবীর গাছপালা, আলো-হাওয়া, জল সব আমার প্রিয়। তোমাদের ওখানে একটাও গাছ নেই। জল নেই। আমার ভালো লাগে না।"

মেয়েটি বলল, "কিন্তু তোমাদের এই পৃথিবীতে খাবার পাওয়া যায় না। এখনও কত মানুষ খেতে পায় না। এখানে একদিকে বিশ্রী গরম, আর একদিকে বিশ্রী ঠাণ্ডা। এই পৃথিবীটা মোটেই ভালো গ্রহ নয়। আমাদের ওখানে তুমি যখন যা-খুশি চাও খেতে পাবে। যে-কোনো আরাম চাও, সব পাবে। তুমি আমাদের ওখানে গিয়ে আর কিছুদিন থাকলে আর কখনও এই বিচ্ছিরি, পচা পৃথিবীতে ফিরতে চাইবে না!"

রণজয় বলল, "ভালো হোক, খারাপ হোক, এই পৃথিবীতে আমি জন্মেছি। এই পৃথিবীই আমার প্রিয়। আমাকে কেন জোর করে নিয়ে যেতে চাইছ? আমি এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে চাই না।"

মেয়েটি এবার জোরে হেসে উঠে বলল, "এবার আর তুমি ফিরে আসতে পারবে না। নীল মানুষ, এবার তোমার মনটা আমরা বদলে দেব। পৃথিবীর কথা তোমার আর মনেই পড়বে না!"

একটা গোঁ গোঁ শব্দ শুনে রণজয় বুঝতে পারল, এবার রকেটটা ছাড়বার উদ্যোগ করছে। আর বেশি সময় নেই। একবার পৃথিবীর মাটি ছেড়ে উড়তে শুরু করলেই এমন প্রচণ্ড গতি এসে যাবে যে প্রায় চোখের নিমেষেই উড়ে যাবে মহাশূন্যে।

রণজয় মিনতি করে বলল, "তোমরা সভ্য-শিক্ষিত প্রাণী, তবু তোমরা ডাকাতি করতে আসো কেন? মানুষকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া অন্যায়, তা তোমরা বোঝো না?"

মেয়েটি বলল, "অন্যায়? সে আবার কী? এ কথাটার মানেই তো আমরা জানি না। আমাদের যখন যেটা ইচ্ছে হয়, তখন সেটা করি!"

রণজয়ের পাশের লোকটি তার নিজের ভাষায় কী যেন বলে রণজয়ের হাত ধরে তাকে বসিয়ে দিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সে হাতটা ছেড়ে দিয়ে যেন ব্যথা পেয়ে উঃ করে উঠল।

রণজয়ের হাতটা ফোঁটা ফোঁটা রক্ত আর ঘামে ভেজা। সেই হাতটা ধরেই লোকটা ছেড়ে দিয়েছে। রণজয়ের মনে পড়ে গেল, এরা কোনো তরল জিনিস সহ্য করতে পারে না। হঠাৎ জলের মধ্যে পড়ে গেলেই এরা মরে যায়। প্রথমবার রণজয় যখন দুঃখে কেঁদে ফেলেছিল, তখন তার চোখের জলের কয়েকটা ফোঁটায় ওদের একজনের হাত পুড়ে গিয়েছিল!

আর সময় নেই, আর সময় নেই! রকেটটা এক্ষুণি উড়বে! রণজয়ের কাছে একটাই মাত্র অস্ত্র আছে।

সে ঘুরে দাঁড়িয়েই পাশের লোকটির গালে থুঃ করে খানিকটা থুতু ছিটিয়ে দিল।

লোকটা বিকট একটা আর্তনাদ করে দমাস করে পড়ে গেল মেঝেতে। সেই থুতু যেন তার গায়ে বুলেটের মতন লেগেছে।

ওদের দলনেত্রী ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। সে তার নিজের ভাষায় অন্য লোক দুটিকে কী যেন আদেশ করল। সেই লোক দুটি রণজয়কে ধরবার জন্য এগিয়ে আসতেই রণজয় এক লাফে চলে গেল দেয়ালের দিকে। মুখ সরু করে সে খুব জোরে আবার থুঃ থুঃ করল। একটা ফস্কে গেল, অন্য লোকটির গায়ে থুতু লাগতেই সে আগুনে পোড়া মানুষের মতন ছটফট করতে লাগল। বাকি লোকটি কোমরে হাত দিল একটা অস্ত্র তোলবার জন্য।

রণজয় মুখখানা ঝুঁকিয়ে ঠিক তার মুখের ওপর এক দলা থুতু ছুঁড়ে দিল। সেই লোকটি আকাশ-ফাটানো চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল।

ওদের দলনেত্রী এবার কঠোর গলায় বলল, "যথেষ্ট হয়েছে। ওহে পলাতক নীল মানুষ, তুমি এবার শান্ত হবে, না এই মুহূর্তে তোমাকে শেষ করে দেব?"

সেই মেয়েটির হাতে একটা ছোট্ট গোল মতো অস্ত্র। রণজয় জানে, ওর থেকে ঝলকে ঝলকে নীল আগুন বেরোয়। সেই নীল আগুন মানুষ তো দূরের কথা, ইস্পাত পর্যন্ত গলিয়ে দিতে পারে।

রণজয়ের গলা শুকিয়ে গেছে। মুখে আর থুতু নেই। থাকলেও অতদূরে তার থুতু পৌঁছত না! আর কোনো উপায় নেই, এবার তাকে হার স্বীকার করতেই হবে। ঐ গোল যন্ত্রটার সঙ্গে কোনো চালাকি চলে না।

মেয়েটি বলল, "আস্তে আস্তে বসে পড়ো। দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাও। এবার তোমাকে অজ্ঞান করে ফেলতে হবে দেখছি! তোমাকে ভালো কথা বললেও...."

মেয়েটির কথা শেষ হলো না, সে আঁ আঁ করে চিৎকার করে উঠল।

রণজয় দেখল, গুটুলি কখন চুপি চুপি মেয়েটির পেছন দিয়ে চলে গেছে। এবার সে লাফিয়ে উঠে পেছন থেকে মেয়েটির মুখখানা ধরে তার দুই কানের মধ্যে থুতু ছিটিয়ে দিচ্ছে।

মেয়েটি মেঝেতে পড়ে যেতেই রণজয় এক লাফে গিয়ে রকেটের দরজাটা খুলে ফেলল। রকেটটা সবে মাত্র মাটি ছাড়তে শুরু করেছে। রণজয় চিৎকার করে বলল, "গুটুলি, লাফিয়ে পড়!"তারপর নিজেও সে ঝাঁপ দিল!

রণজয় আর গুটুলি দু'জনেই পড়ল একটা বড় গাছের ওপর। তারপর গড়াতে গড়াতে, ডাল-পালার মধ্যে দিয়ে পড়ল মাটিতে। খুব বেশি তাদের লাগেনি।

গুটুলি বলল, "ওস্তাদ, ওরা কি আবার ফিরে আসবে?"

রণজয় বলল, "ঐ রকেট একবার শূন্যে উঠে গেলে ফিরে আসতে সময় লাগে। তার আগেই আমরা পালাব। দাঁড়া, একটু জিরিয়ে নিই। এখনও বুক ধড়ফড় করছে রে! এমন ভাবে যে বাঁচতে পারব কল্পনাও করিনি!"

গুটুলি থুঃ থুঃ করে নিজের হাতে দু'বার থুতু ছিটিয়ে বলল, ওস্তাদ, সত্যিই থুতুর এত শক্তি? কোনোদিন তো বুঝিনি!

রণজয় বলল, থুতু এমনি এমনি খরচ করিস না! ভবিষ্যতে আবার কাজে লাগতে পারে!

নীল মানুষের বন্ধু

রণজয়ের জন্য দর্জি এসেছে। তার নতুন প্যান্ট তৈরি হবে। বাগানের আম বিক্রি করে বেশ কিছু টাকা পেয়েছেন বাবা। ছেলে ফিরে আসায় তিনি এত খুশি হয়েছেন যে বলে দিয়েছেন, যত টাকা লাগে লাগুক, রণজয়ের জন্য তিনখানা করে প্যান্ট শার্ট শিগগিরই তৈরি করতে হবে।

দর্জিকে ডেকে আনা হয়েছে বাড়িতে। রণজয়কে প্রথম দেখেই সে হাত পা ছড়িয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল!

মাথায় জলটল দিয়ে তার জ্ঞান ফেরানো হলো বটে, তবু সে চোখ ফ্যালফ্যাল করে বলতে লাগল, কী দেখলাম! ও কে? অসুর না দৈত্য!

রণজয়ের দাদা সঞ্জয় বলল, আরে ছি ছি ছি, তুমি এত সহজে অজ্ঞান গেলে? বইটই পড়ো না কিছু? মানুষ বুঝি লম্বা হতে পারে না? পৃথিবীর কত জায়গায় কত লম্বা লোক থাকে। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস নামে একটা বই আছে। সেই বইতে সাড়ে আট ফুট লম্বা মানুষের ছবি রয়েছে। আমার ভাই তো মাত্র আট ফুট পাঁচ ইঞ্চি।

দর্জি বলল, মানুষ? ও সত্যি মানুষ?

সঞ্জয় বলল, হ্যাঁ, ও আমার ভাই রণজয়। হঠাৎ লম্বা হয়ে গেছে। বেশি লম্বা হয়ে গেছে!

দর্জি বলল, তা বলে একেবারে তালগাছের মতো লম্বা? ওর গায়ের রং নীল কেন? একেবারে কলমের কালির মতো নীল?

সঞ্জয় বলল, একটা অসুখে ওরকম নীল হয়ে গেছে। অসুখ করলে অনেকের গায়ের রং কালো হয়ে যায় না?

দর্জি তবু ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না। সে বলল, রং কালো হয় শুনেছি, কিন্তু নীল রং হয় তা কখনও শুনিনি! দুর্গাপুজোর সময় মহিষাসুরের মূর্তিটাই তো নীল রঙের হয় দেখি!

সঞ্জয় বলল, কেন, শুধু মহিষাসুরের রং নীল কেন? শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রং নীল নয়? শ্রীরামচন্দ্রের?

এ কথা বলেই সঞ্জয় কপালে হাত জুড়ে নমস্কার করে বলল, ওঁরা অবশ্য এমনিই নীল!

দর্জিটি বলল, দাদা, সত্যি করে বলুন তো, কাছে গেলে আমায় কামড়ে-টামড়ে

দেবে না তো? তুলে আছাড় মারবে না?

সঞ্জয় হেসে বলল, আরে না না! আমার ভাইটি খুব নিরীহ! অতবড় চেহারা হলে কী হয়, আসলে এখনও শিশুই রয়ে গেছে। চলো, চলো, তোমার ভয় নেই কিছু!

বাড়ির ভেতরের দিকে উঠোনে একটা তোয়ালে শুধু কোমরে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে রণজয়। এতদিন সে বনে-জঙ্গলে থাকত, জামা-কাপড় সব ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে। তার খালি গা, বুকেটুকে একটাও লোম নেই। সমস্ত শরীরটা নীল পাথরের মূর্তির মতন। যারা রণজয়কে চেনে না, তারা দেখলে তো ভয় পাবেই!

একটা লম্বা টুল আনা হলো। তার ওপর দাঁড়িয়ে দর্জি মাপ নিতে লাগল। তার হাত দুটো এখনও থরথর করে কাঁপছে, রণজয়ের মুখের দিকে সে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না।

রণজয় মুচকি হেসে ফিসফিস করে বলতে লাগল, ভয় নেই! ভয় নেই!

কোনোরকমে রণজয়ের মাপ নেওয়া শেষ হলো।

তখন রণজয় বলল, এবার আমার বন্ধুর জামা প্যান্টের মাপ নাও।

উঠোনের এক কোণে নীল ডাউন হয়ে বসে গুটুলি একটা পেয়ারা খাচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে দর্জির চোখ আবার কপালে উঠল। সে বলল, ওরে বাবা, এ আবার কী? এত ছোট মানুষ? এ-ও কি অসুখের পর ছোট হয়ে গেছে নাকি?

গুটুলি তেজের সঙ্গে বলল, না, আমার অসুখ-টসুখ হয়নি। তা ছাড়া আমি মোটেও ছোট মানুষ না। আমি একটু বেঁটে, এই যা! ছোট মানুষ আর বেঁটে মানুষ কি এক?

দর্জি এবার ফিক করে হেসে ফেলে বলল, এইটুকু মানুষের গলার আওয়াজ তো কম নয়! ঠিক যেন একটা শানাই!

গুটুলির কাছে এসে ফিতে খুলে দর্জি বলল, এই, নড়াচড়া করবি না, চুপ করে দাঁড়া।

গুটুলি আবার ধমকের সুরে বলল, আপনি আমাকে তুই তুই বলছেন কেন? আমি কি বাচ্চা ছেলে নাকি?

দর্জি তবু হাসতে লাগল।

মাপ নেওয়া শেষ করে দর্জি চলে যাবার পর সঞ্জয় বলল, মজার ব্যাপারটা দেখলে? রণজয়কে দেখে দর্জি ভয়ে ভির্মি খেয়েছিল। আর গুটুলিকে দেখেই হাসতে লাগল!

রণজয় বলল, গুটুলির চেহারাটা ছোট্টখাট্টো হলে কী হবে, ওর বুদ্ধি কারুর চেয়ে কম নয়।

এর পর এক মুচিকে ডেকে বানানো হলো ওদের দু'জনের জুতো।

অনেকদিন পর নতুন জামা-প্যান্ট-জুতো পরে, সেজেগুজে রণজয় গুটুলিকে নিয়ে বেরুলো রাস্তায়।

গ্রামের অনেক লোকেই এখন রণজয়ের কথা জেনে গেছে। ভয়টাও এখন

ভেঙেছে। রণজয় কারুর কোনো ক্ষতি করে না। কোনো গাছটাছও ভাঙে না। কিন্তু গুটুলিকে দেখে সবাই মজা পায়। বাচ্চা ছেলেরা গুটুলিকে ঘিরে ধরে হাততালি দিতে দিতে বলে, এই বাঁটকুল! এই বাঁটকুল! কেউ কেউ তার গায়ে ঢিল ছোঁড়ে।

রণজয় ঘুরে দাঁড়ালেই অবশ্য সবাই চোঁ চোঁ দৌড় মারে।

গুটুলিকে নিয়ে রণজয় নদীর ধারে এসে বসল। সন্ধে হয়ে এসেছে। এখানে আর কোনো মানুষজন নেই।

রণজয় আস্তে আস্তে বলল, জানিস গুটুলি, অনেকদিন আগে এই রকম এক সময়ে আমি নদীর মাছ ধরতে এসেছিলাম। হঠাৎ এক সময় আকাশ থেকে একটা সাদা বল খসে পড়ল। সেই বলকে আমি ধরতে গেলাম। তারপর থেকেই আমার এই অবস্থা। চেহারাটাও লম্বা হতে লাগল আর গায়ের রংটাও বদলে গেল।

রণজয় নিজের কাহিনী বলে যাচ্ছে, গুটুলি কোনো সাড়াশব্দ করছে না।

এক সময় হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনে রণজয় চমকে মুখ ফেরাল।

গুটুলির থুতনিতে একটা আঙুল ছুঁইয়ে সে বলল, এ কী, তুই কাঁদছিস কেন? কী হয়েছে?

গুটুলি তবু কান্না থামাচ্ছে না।

রণজয় আবার কাতরভাবে জিজ্ঞেস করল, তোর কী হয়েছে? বাড়ির জন্য কষ্ট হচ্ছে?

গুটুলি কাঁদতে কাঁদতেই বলল, আমার কোনো বাড়িই নেই!

রণজয় জিজ্ঞেস করল, তা হলে কিসের কষ্ট হচ্ছে? নতুন জুতোয় পায়ে ফোস্কা পড়েছে?

গুটুলি বলল, না, সে সব কিছু না। আমার কষ্ট হচ্ছে অন্য কারণে। বন্ধু, এবার তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে!

রণজয় বলল, সেকি! আমায় ছেড়ে যাবি কেন? আমার বাড়িই তো তোর বাড়ি। আমার মা তোকে ভালোবাসে। আমার দাদাও তোকে পছন্দ করে।

গুটুলি বলল, সে জন্যও নয়। তুমি লম্বা, আমি বেঁটে। তোমাকে দেখে লোকে ভয় পায়, আমাকে দেখে লোকে হাসে। কেউ আমার মাথায় চাঁটি মারে, কেউ ঢিল ছোঁড়ে। যখন বনে-জঙ্গলে ছিলাম, তখন বেশ ছিলাম। লোকজনের মাঝখানে থাকলে কেউ আমাকে গ্রাহ্য করবে না। তোমার পাশে থাকলে আমাকে আরও বেশি বেঁটে দেখায়! নাঃ, আমি চলেই যাব!

রণজয় বলল, তুই আমার একমাত্র বন্ধু। তুই চলে গেলে আমি থাকব কী করে? না, না, গুটুলি, তোকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না!

গুটুলি মাটিতে চাপড় মারতে মারতে বলল, আমি লম্বা হতে চাই! আমি লম্বা হতে চাই! আমি তোমার মতন লম্বা হতে চাই!

রণজয় বলল, লম্বা হওয়ার অনেক জ্বালা রে, গুটুলি! দ্যাখ না, আমি ইচ্ছে মতন চলাফেরা করতে পারি না। কেউ আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না।

গুটুলি বলল, আর বেঁটে হওয়ার কী জ্বালা, তা তো তুমি বুঝবে না! এর থেকে লম্বা হওয়া অনেক ভালো। তোমার সেই সাদা বলটা কোথায়? সেটা যোগাড় করে আনো। আমি লম্বা হব!

রণজয় বলল, সেটা কোথায় পাব রে! মহাকাশের লোকেরা সেটা তো আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

গুটুলি বলল, ওসব জানি না। লম্বা না হলে আমি আর এখানে থাকতে চাই না। আমি আর বেঁচেও থাকতে চাই না।

রণজয় আলতো করে গুটুলির পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, অমন করিস না। মরার কথা বলতে নেই। ঠিক আছে, তুই লম্বা হতে-চাস তো! দেখা যাক, কী ব্যবস্থা করা যায়। আর কয়েক দিন ধৈর্য ধরে থাক।

পরদিন ওরা গেল শহরের দিকে। ট্রেনে চেপে এল, কিন্তু কোনো অসুবিধা হলো না। অনেকেই অবাক হয়ে তাকায় বটে, রণজয়কে দেখে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছে। কিন্তু ভয়ে চোখ উল্টে ফেলছে না।

শহরের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে রণজয় বলল, কী আশ্চর্য ব্যাপার বল তো গুটুলি!

আগে আমাকে দেখলেই লোকে ভয়ে পালাত। এখন তো সে রকম কিছু হচ্ছে না। হঠাৎ সব বদলে গেল কি করে?

গুটুলি বলল, কারণটা বুঝলে না? আগে যখন তুমি জঙ্গল থেকে বেরুতে, তখন তোমার খালি গা, জামা ছিল না, ছেঁড়াখোঁড়া ময়লা ধুতি জড়ানো। আর মাথার চুলও আঁচড়াতে না। সবাই তাই মনে করত জঙ্গলের দৈত্য-দানব। এখন তোমার ভদ্দরলোকদের মতন নতুন পোশাক। আজকাল পোশাক দেখেই তো সবাই মানুষ চেনে!

রণজয় বলল, হায় রে, মানুষ দেখে মানুষ চেনা যায় না। পোশাক দেখে ভদ্দরলোকদের চিনতে হয়। তা হলে তো দর্জিদেরই জয়!

গুটুলি বলল, তবু দ্যাখো, তোমাকে দেখে কেউ হাসছে না। আমায় দেখে সবাই

হাসছে। এ পৃথিবীতে লম্বাদেরই জয়।

—তুই আমার সমান লম্বা হতে চাস, গুটুলি?

—না, না, তোমার সমান নয়। ছোট ছেলেরা আমাকে দেখে ভয় পাক, তাও আমি চাই না। এই ধরো, মাঝামাঝি। তোমার শরীর থেকে খানিকটা কমিয়ে যদি আমার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যেত!

—ওঃ, তা হলে কী ভালোই হতো! তুই আর আমি সমান সমান! আচ্ছা, সামনে ওটা কী দেখা যাচ্ছে, চল তো যাই!

গুটুলি সামনে তাকিয়ে দেখল।

রাস্তার ওপারে একটা পার্ক। তার এক দিকটা টিন দিয়ে ঘেরা। সেখানে গেটের ওপর সাইনবোর্ডে লেখা : নবীন ব্যায়ামাগার।

তার তলায় আবার ছোট ছোট অক্ষরে লেখা : শরীর মজবুত করতে হলে এখানে যোগ দিন!

গুটুলি আর রণজয় রাস্তা পার হয়ে সেই গেট ঠেলে ঢুকল।

দুপুরবেলা সেখানে আর লোকজন কেউ নেই, শুধু ব্যায়ামাগারের ম্যানেজার একা হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরে ওঠবোস করে যাচ্ছেন।

রণজয় কোনো ভূমিকা না করেই বলল, আপনারা এখানে শরীর মজবুত করে দেন। আপনারা বেঁটে লোককে লম্বা করে দিতে পারেন?

ম্যানেজার মশাই বসা অবস্থায় রণজয়ের পা থেকে দেখতে লাগলেন। পেট-বুক-গলা পর্যন্ত চোখ বোলাতে বোলাতে তাঁর মুখখানা অনেকটা হাঁ হয়ে গেল। তিনি বললেন, অ্যাঁ? অ্যাঁ? অ্যাঁ? আরও লম্বা? আপনি আরও লম্বা হতে চান?

রণজয় হেসে বলল, না, আমি না। এই যে আমার বন্ধু। এর কথা বলছি।

রণজয়ের আড়ালে গুটুলিকে আগে দেখতে পাননি ম্যানেজার মশাই। এবার তিনি ভালো করে দেখে নাক কুঁচকে বললেন, ধুৎ! ধুৎ! ধুৎ!

রণজয় বলল, এ কী, আপনি তিনবার ধুৎ বললেন কেন?

ম্যানেজার মশাই বললেন, আমি এক কথা তিনবার তিনবার তিনবার বলি!

রণজয় বলল, আপনি একবারই বা ধুৎ বলবেন কেন?

ম্যানেজার মশাই বললেন, ঐটুকু বেঁটে বাঁটকুল কখনও লম্বা লম্বা লম্বা হয়? কোনো আশা নেই, আশা নেই, আশা নেই!

রণজয় বলল, সে কি মশাই? বেঁটে লোকরা কোনোদিন লম্বা হতে পারে না?

ম্যানেজার মশাই বললেন, ধুৎ! ধুৎ! ধুৎ! তা কখনও হয়। তবে আপনারা প্রফেসার হংসধ্বজের কাছে গিয়ে দেখতে পারেন। সে ওসব কী যেন করে শুনেছি!

রণজয় জিজ্ঞেস করল, ঠিক আছে। প্রফেসর হংসধ্বজের ঠিকানা?

ম্যানেজার মশাই ঘরে ঢুকে একটা কার্ড নিয়ে এসে বললেন, এই নাও, এই নাও, এই নাও! যাও, যাও, যাও!

রণজয়ও তিনবার বলল, যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি!

কার্ডখানাতে লেখা, প্রফেসর হংসধ্বজ রায়। যে-কোনো সমস্যা, চলে আসুন! ঠিকানাটা খুব দূরে নয়।

রণজয় বলল, চল রে, আজই একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। হংসধ্বজের নামটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

সেটা একটা সিনেমা হলের মতন বাড়ি। দু'দিকে দুটো গেট। মাঝখানের দেওয়ালে নানা বয়সের অনেক নারী-পুরুষের ছবি। বেঁটে, মোটা, রোগা, লম্বা।

বাড়িটার সামনে এসে রণজয় বলল, এবার তুই আগে যা গুটুলি। আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি।

ভেতরের অফিস ঘরে প্রফেসার হংসধ্বজ রায় টেবিলে বসে লেখালেখি করছিল। গুটুলি তার কাছে গিয়ে বলল, এই যে শুনুন!

হংসধ্বজ এক পলক গুটুলির দিকে তাকিয়ে বলল, যা, যা, এখন বিরক্ত করিস না। কাজ করছি!

গুটুলি বলল, আপনার সঙ্গে একটা কাজের কথা আছে!

হংসধ্বজ ড্রয়ার খুলে একটা লজেন্স বার করে গুটুলির হাতে দিয়ে বললেন, এই নে, যা পালা!

গুটুলি রাগ করে লজেন্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, আপনি কি আমাকে বাচ্চা ছেলে পেয়েছেন নাকি? আমার বয়েস একুশ।

হংসধ্বজ এবার দারুণ ধমক দিয়ে বলল, আ মলো যা! তোর বয়েস কত আমি কি তা জানতে চেয়েছি? জেনে আমার লাভ কী? কেন আমায় বিরক্ত করছিস!

গুটুলি বলল, আমি একটা কাজের কথা বলতে এসেছি!

হংসধ্বজ বলল, আমি কোনো কাজের কথা শুনতে চাই না।

গুটুলি এবার বাইরের দরজার কাছে এসে হাঁক দিল, বন্ধু, তুমি এবার ভেতরে এস!

রণজয় ধপধপ করে পায়ের শব্দ করতে করতে ভেতরে আসতেই হংসধ্বজ চমকে তাকাল। চ্যাঁচাতে গিয়েও গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। অজ্ঞান হয়ে সে চেয়ারসুদ্ধু উল্টে পড়ে গেল!

গুটুলি বলল, দেখলে তো বন্ধু, বেঁটে লোকদের কেউ গ্রাহ্য করে না। আমাকে বকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল, আর তোমাকে দেখেই অজ্ঞান হয়ে গেল।

টেবিলের ওপর এক গেলাস জল রাখা ছিল। সেটা মাথায় ঢেলে দিতেই হংসধ্বজ চোখ মেলে তাকাল।

রণজয় বলল, ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই! আমরা কাজের কথা বলতে এসেছি!

হংসধ্বজ এবার দু'জনকে দেখল ভালো করে। তারপর উঠে বসে খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, তোমরা কাজ চাও! এক্ষুণি কাজ দিতে পারি। দু'হাজার টাকা করে মাইনে পাবে।

রণজয় অবাক হয়ে বলল, কাজ মানে চাকরি? আপনি আমাদের চাকরি দিতে চাইছেন? কী চাকরি?

হংসধ্বজ বলল, খুব সোজা কাজ। আমার বাড়ির দু'দিকের দরজায় তোমরা দু'জনে দাঁড়িয়ে থাকবে। একজনের গায়ে লেখা থাকবে 'আগে', আর একজনের গায়ে লেখা থাকবে 'পরে'।

রণজয় জিজ্ঞেস করল, তার মানে?

হংসধ্বজ বলল, আমার এটা একটা নার্সিংহোম। এখানে লোকে চিকিৎসা করতে আসে তো। বেঁটে লোকটির গায়ে লেখা থাকবে 'আগে', তার মানে আমার এখানে চিকিৎসা করাবার আগের অবস্থা। আর আর একজন 'পরে'। তার মানে, চিকিৎসার পরের অবস্থা!

রণজয় বলল, আপনার এখানে বেঁটে লোককে লম্বা করা যায়?

হংসধ্বজ বলল, হ্যাঁ, কেন যাবে না? সব করা যায়!

রণজয় বলল, বাঃ বাঃ বাঃ! চমৎকার! তা হলে তো কোনো চিন্তাই নেই। আপনি আমার এই বন্ধুটিকে লম্বা করে দিন তো! তারপর আমরা আপনার সব কথা শুনব!

হংসধ্বজ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, তোমার মাথা খারাপ? এই বেঁটে বক্কেশ্বরকে কি কেউ লম্বা করতে পারে?

গুটলি ফুঁসে উঠে বলল খবরদার!

রণজয়ও হুংকার দিয়ে বলল, আপনি আমার বন্ধুকে অপমান করছেন কেন? এই না বললেন, বেঁটে লোককে আপনি লম্বা করে দিতে পারেন?

হংসধ্বজ বললেন, সে বলেছি বলেছি বেশ করেছি। আমার যা খুশি আমি তাই বলব!

গুটুলি অমনি ছুটে গিয়ে হংসধ্বজের একটা হাত ধ্যাঁচ করে কামড়ে দিল।

হংসধ্বজ আঁতকে উঠে বললেন, এ কী?

গুটুলি বলল, আমাকে অপমান করেছ কেন? আমারও যা খুশি তাই করব।

হংসধ্বজ এবার ভয়ে চুপসে গিয়ে রণজয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমিও কামড়ে দেবে নাকি? তা হলে আর আমি বাঁচব না! অ্যাঁ? সত্যি সত্যি আর বাঁচব না!

রণজয় ঘাড় ধরে হংসধ্বজকে উঁচুতে তুলে নিল। তারপর বলল, আমি সব সময় কামড়াই না। তবে, আমারও যা ইচ্ছে তাই করব!

হংসধ্বজ পা দোলাতে দোলাতে বলল, নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও নামিয়ে দাও আমার ঘাড়ে ব্যথা, আরও ব্যথা হয়ে যাবে।

রণজয় তাকে মাটিতে নামাবার পর সে বলল,আসল ব্যাপার কি জানো, রোগা লোকেরা মোটা হয়ে গেলে একটু বেঁটে দেখায় আর মোটা লোকেরা খুব রোগা হয়ে গেলে খানিকটা লম্বা মনে হয়। আজকাল রোগা-মোটা করার অনেক জায়গা আছে, তাই আমি রোগা-লম্বা করার কথা বলি। আসল বেঁটেকে লম্বা করা আমার সাধ্য নয়। তবে তোমরা একটা কাজ করতে পার। তোমরা মেঘধ্বজ আচার্যের কাছে যাও।

গুটুলি জিজ্ঞেস করল, সে আবার কে?

হংসধ্বজ বলল, সে একজন জাদুকর আর বৈজ্ঞানিক। সে অনেক কিছু পারে। সে তোমাদের মনোবাঞ্ছা ঠিক পূর্ণ করে দেবে।

গুটুলি ধমক দিয়ে বলল, আবার শক্ত শক্ত কথা বলছ। ঐ কথাটার মানে কী?

রণজয় বলল, চল, চল, এ কথাটার মানে আমি জানি!

হংসধ্বজের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে রণজয়েরা চলে এল মেঘধ্বজ আচার্যের বাড়িতে।

এ বাড়িটার সামনের দিকটা ভাঙা-চুরো, বন-জঙ্গলে ভর্তি। কিন্তু ভেতরে পরপর তিনখানা ঘর লাল, নীল আর সবুজ রং করা।

রণজয়রা প্রথমে লাল রঙের ঘরটার দরজায় ধাক্কা দিল।

একজন বুড়ো মতন লোক শুধু মাথাটা বার করে জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই?

রণজয় বলল, আমরা মেঘধ্বজ আচার্যের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বৃদ্ধটির মাথাভর্তি চুল, মুখভর্তি দাড়ি, চোখে রূপোলি ফ্রেমের চশমা।

রণজয়কে দেখে তিনি একটুও অবাক না হয়ে বললেন, বা বা বা বা! এই রকম একজনকেই তো খুঁজছিলাম। তুমি কি কলসীর দৈত্য নাকি হে?

রণজয় বলল, আজ্ঞে না। আমি মানুষ।

বৃদ্ধ বললেন, তুমি মানুষ? তবে তো আরও চমৎকার। তুমি আমার জন্য একটু মরতে পারবে?

রণজয় গুটুলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, একটুখানি মরা মানে কী রে?

বৃদ্ধ বললেন, তুমি দড়াম করে মরে যাও না। তারপর তোমার শরীরটা আমি কাটাছেঁড়া করব। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করব। দেখব, দৈত্যদের সঙ্গে মানুষদের কী তফাৎ! দৈত্য বলে সত্যি কিছু ছিল কিনা।

রণজয় বলল, আজ্ঞে, এই সামান্য কারণে তো আমি মরতে রাজী নই। আমার আরও বেশ কিছুদিন বাঁচার ইচ্ছে আছে!

বৃদ্ধ তাতে যেন বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, তবে ঐ দৈত্যের মতন চেহারা নিয়ে আমার কাছে এসেছ কেন?

রণজয় বলল, শুনেছি, আপনি মানুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন, তাই আপনার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি।

বৃদ্ধ বললেন, বটে? তোমার মনোবাঞ্ছা আমি পূর্ণ করব কেন শুধু? তাতে আমার কী লাভ হবে? আমার বুঝি সময়ের দাম নেই?

রণজয় বলল, আমাদের মনোবাঞ্ছা যদি পূর্ণ হয়, তাহলে আপনাকে আমরা নিশ্চয়ই কিছু দেব। আপনি কী চান বলুন!

বৃদ্ধ মুখ ভেংচে বললেন, ইস! আবার বলে কী চান! তুমি আমার জন্য সামান্য মরতেও রাজী হলে না! আচ্ছা, আগে শুনি তোমাদের মনোবাঞ্ছা কী!

রণজয় হাত কচলে বলল , আজ্ঞে দেখুন, আমার এই বন্ধুটির উচ্চতা খুব কম।

তাই নিয়ে ওর মনে খুব দুঃখ। আপনি ওকে লম্বা করে দিতে পারেন?

বৃদ্ধ এবার গুটুলিকে দেখে খুকখুক করে হেসে বললেন, কেন, বেশ তো চেহারাটা। লম্বা হয়ে কী হবে?

গুটুলি জিজ্ঞেস করল, আপনি লম্বা করে দিতে পারেন কি না, আগে সেটা ঠিক করে বলুন!

বৃদ্ধ দু'দিকে ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, পারি। তা পারি। কিন্তু একটা মুস্কিল আছে। পৃথিবীটা একটা নিয়মে চলে জানো তো? একটা বেঁটে লোক হঠাৎ লম্বা হয়ে গেলে আর একজন লম্বা লোককে বেঁটে হতে হবে! তোমার বদলে তা হলে কে বেঁটে হবে বলো?

রণজয় আগ্রহের সঙ্গে বলল, আমি! আমি!

বৃদ্ধ বললেন, তুমি? ইস, এত বোকা তুমি? এতখানি লম্বা চেহারা কেউ নষ্ট করে?

রণজয় বলল, আমি এতটা লম্বা ধ্যাড়েঙ্গা থাকতে চাই না!

বৃদ্ধটি বললেন, বেশ, হবে এস!

বৃদ্ধটি এবার তাদের নিয়ে গেলেন নীল ঘরে। সে ঘরটা অনেক রকম যন্ত্রপাতিতে ভর্তি। বৃদ্ধটি কয়েকটা প্লাগ লাগিয়ে দিলেন ওদের দু'জনের গায়ে। তারপর একটা মেশিনের বোতাম টিপতেই গোঁ গোঁ শব্দ হতে লাগল।

রণজয় শুধু একটু সুড়সুড়ির মতন বোধ করল, আর কিছু টের পেল না। গুটুলি থরথর করে কাঁপছে।

একটু পরে বৃদ্ধটি আনন্দে হাততালি দিতে দিতে বললেন, বাঃ বাঃ! ঠিক হয়েছে! আমি আর তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না।

রণজয় জিজ্ঞেস করল, তার মানে?

বৃদ্ধ বললেন, এই সহজ কথাটার মানেও বুঝতে পারলে না? তোমরা অদৃশ্য হয়ে গেছ। তোমাদের আর কেউ দেখতে পাবে না।

রণজয় নিজের গায়ে চোখ বুলিয়ে বলল, কই, আমি তো আমাকে দেখতে পাচ্ছি!

বৃদ্ধ বললেন, তা তো পাবেই। অদৃশ্য হলেও নিজেকে দেখা যায়।

রণজয় বলল, আমি গুটুলিকেও দেখতে পাচ্ছি।

বৃদ্ধ বললেন, অদৃশ্য লোকেরা নিজেদের দেখতে পায় না কে বলল? একজন ভূত কি অন্য ভূতকে দেখতে পায় না? অন্য মানুষ আর দেখতে পাবে না তোমাদের।

রণজয় বলল, কিন্তু আমরা তো অদৃশ্য হতে চাইনি? এ কী করলেন?

বৃদ্ধ বললেন, আহা হা, ব্যস্ত হচ্ছ কেন? বেঁটে কিংবা লম্বা কি আর এমনি এমনি হওয়া যায়? আগে অদৃশ্য হতে হয়। এরপর তোমরা একজন বেঁটে আর একজন লম্বা হবে! চল, এবার পাশের ঘরে।

বৃদ্ধর কথামতন ওরা দু'জন চলে এল সবুজ ঘরে।

বৃদ্ধ এবার একটা পিচকিরি দিয়ে খানিকটা গন্ধ জল ছিটিয়ে দিলেন ওদের গায়ে। আপনমনে হাসলেন ফিকফিক করে। ঘরটা অন্ধকার করে দিলেন সব আলো নিভিয়ে।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এখনও ভেবে দ্যাখো, যে বেঁটে আছ, সে লম্বা হতে চাও? লম্বা যে, সে বেঁটে হতে চাও?

গুটুলি আর রণজয় দু'জনেই একসঙ্গে বলল, হ্যাঁ, চাই!

বৃদ্ধ বললেন, তা হলে এবারে পেছনের দেয়ালের দিকে দ্যাখো।

আবার আলো জ্বলতেই ওরা পেছন ফিরে দেখল, দেয়ালের গায়ে দুটো বিরাট গোল মতন আয়না। তাতে ফুটে উঠলো দুটো বিকট মুখ!

গুটুলি দেখল, তার মুখখানা বিরাট লম্বা হয়ে গেছে। কান দুটো টেনিস র‍্যাকেটের মতন, নাকের ফুটো দুটো রাস্তার গর্তের মতন!

আর রণজয় দেখল, তার শরীরটা চেপ্টে একেবারে ছোট্ট হয়ে গেছে। মুখখানা একটা বাচ্চা কচ্ছপের মতন। নাক আর কান দেখাই যায় না!

গুটুলি চেঁচিয়ে বলল, ওরে বাবা, আমি এত লম্বা হতে চাই না!

রণজয় বলল, আমি এত বেঁটে হতে চাই না!

দু'জনে এই কথা বলে চিৎকার করতে লাগল। আর হাততালি দিয়ে হাসতে লাগলেন বৃদ্ধ।

একটু পরে বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, তবে, তোমরা কী চাও?

ওরা দু'জনেই বলল, আগের মতন করে দিন। আগের মতন করে দিন!

বৃদ্ধ আবার আলো নিভিয়ে দিলেন। দরজা খুলে দিয়ে বললেন, যাও, বাড়ি যাও! শুধু শুধু আমাকে এত খাটালে। আমার বাড়ির সামনে অনেক ভাঙা ইট আর জঞ্জাল জমে আছে। কাল এসে সাফ করে দিয়ে যেও!

রণজয় বলল, নিশ্চয়ই দেব! কিন্তু কী ব্যাপারটা হলো বলুন তো? আমরা দু'জনেই বদলাবদলি হয়ে গিয়েছিলাম! গুটুলি খুব লম্বা আর আমি অত বেঁটে! আবার ঠিক জায়গায় ফিরে এসেছি?

বৃদ্ধ বললেন, কনভেক্স আর কনকেভ!

রণজয় অবাক হয়ে বলল, তার মানে?

বৃদ্ধ বললেন, যাও যাও, বাড়ি যাও, আমাকে আর বেশি খাটিও না! বাড়িতে ডিকশনারি আছে? মানে দেখে নিও!

তারপর তিনি দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন!

ইচ্ছাগ্রহ

জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি যাচ্ছে। একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে সেই গাড়িটার দিকে তাকিয়ে গুটুলি বলল, ইস্, কতদিন আইসক্রিম খাইনি।

রণজয় পা ছড়িয়ে বসে আছে একটা গাছতলায়। সে জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ তোর আইসক্রিমের কথা মনে পড়ল যে?

গুটুলি বলল, কী জানি! হঠাৎ আইসক্রিমের কথা ভেবে মনটা হু-হু করে উঠল।

রণজয় বলল, এই জঙ্গলে তুই আইসক্রিম পাবি কোথায়?

গুটুলি বলল, আমরা কাছাকাছি যে গ্রামগুলোতে রাত্তিরবেলা চুপিচুপি যাই, সেখানেও কেউ আইসক্রিম বানায় না।

রণজয় বলল, আইসক্রিম পাওয়া যায় শহরে। দূর দূর, আমি আর কিছুতেই কোনো শহরে যাব না।

গুটুলিও অবশ্য শহরে যেতে চায় না। শহরের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে ওদের দুজনেরই। রণজয় আট ফিট লম্বা, সাধারণ মানুষের প্রায় দেড় গুণ, আর গায়ের রংটা নীল। তাকে দেখলেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দৈত্য ভেবে ভয় পায় আর বড়রা তাকে মারতে আসে। চেহারাটা বদলে গেলেও সে যে অন্যদের মতনই একজন মানুষ, তা কেউ বোঝে না। আর গুটুলি দারুণ বেঁটে। রণজয়ের কোমরের চেয়েও নীচে থাকে। তাকে দেখলে সবাই হাসে আর মাথায় চাঁটি মারে। অথচ অন্য মানুষদেরই মতন গুটুলির দুঃখ আছে, ভালোবাসা আছে।

চেহারা দিয়ে যে মানুষকে বিচার করা যায় না, তা বেশির ভাগ মানুষই আজও বোঝে না।

রণজয় জিজ্ঞেস করল, কী গাড়ি যাচ্ছে রে?

গুটুলি বলল, একটা বাস। তাতে কত মানুষ বসে আছে। বাসটা থামিয়ে ওদের একটু ভয় দেখাবে?

বাসটা থামানো রণজয়ের পক্ষে খুবই সহজ। রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেই হলো। কোনো গাড়িই তার অত বড় শরীরটাকে ধাক্কা মেরে সরাতে পারবে না। তা ছাড়া গাড়ির ড্রাইভাররা হঠাৎ তাকে দেখেই আঁতকে ওঠে। যারা ভূত-প্রেতে একদম বিশ্বাস করে না, তারাও ভাবে এই একটা সত্যিকারের ভূত।

রণজয় বলল, ওদের ভয় দেখিয়ে কী হবে?

গুটুলি বলল, তবু খানিকটা সময় কাটবে। খানিকটা হাসা যাবে। কিছুই যে

করার নেই।

রণজয় বলল, ও খেলাটাও আর ভালো লাগে না। তুই আইসক্রিম খেতে চাইলি, তার একটা ব্যবস্থা করা যাক। এক কাজ করলে হয়। খানিকটা দুধ আর বরফ খেয়ে নিলেই তো পেটের মধ্যে গিয়ে আইসক্রিম হয়ে যাবে!

গুটুলি খানিকটা নাকি কান্নার সুরে বলল, না, আমি ও রকম চাই না, আসল আইসক্রিম খাব।

রণজয় বলল, তাহলে তো আইসক্রিম বানাতে হয়। দাঁড়া অন্ধকার হোক।

রাত্রি গভীর হলে রণজয় গুটুলিকে কাঁধে নিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে চুপিচুপি একটা গ্রামে ঢুকল। সবাই ঘুমিয়ে আছে। শুধু দু'চারটে কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে লাগল রণজয়কে দেখে। রণজয় একবার ঘুরে দাঁড়াতেই কুকুরগুলো ভয়ে ল্যাজ তুলে পালাল।

এ গ্রামের একটা মিষ্টির দোকান ওরা আগে থেকেই চেনে। মাঝে মাঝে ওরা এরকম রাত্তিরে এসে এই দোকান থেকেই চুরি করে মিষ্টি খেয়ে যায়। ঠিক চুরি নয়, তার বদলে ওরা জঙ্গল থেকে অনেক আম, কাঁঠাল নানারকম ফল রেখে যায়। এখানে আজ এনেছে দু'ছড়া কলা।

প্রথমে ওরা দু'জনে টপাটপ করে কিছু রসোগোল্লা আর সন্দেশ খেয়ে নিল। জঙ্গলে শুধু পাখির মাংস আর খরগোশের মাংস আর ফলমূল খেতে খেতে ওদের একঘেয়ে লাগে। একটা ডাকাতকে ওরা রাঁধুনি হিসেবে রেখেছিল, সে পালিয়েছে।

মিষ্টি খেয়ে পেট ভরাবার পর রণজয় বলল, ঐ দ্যাখ একটা কড়াই ভর্তি দুধ জ্বাল দেওয়া আছে।

গুটুলি বলল, না, আমি দুধ খাব না।

রণজয় বলল, তোকে দুধ খেতে হবে না। কী করে এর খানিকটা দুধ সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যায় দ্যাখ তো! কিছু পাত্র-টাত্র আছে?

গুটুলি বলল, একটা ডেকচি আছে দেখছি। ঢাকনাও আছে।

রণজয় বলল, ডেকচিটাতে দুধ ভরে ভালো করে মুখটা বেঁধে নে। ছলকে যেন না পড়ে।

রণজয় নিজেই এক ঠোঙা চিনি আর একটা দেশলাইও খুঁজে নিল। তারপর বলল, চল গুটুলি, আমি আইসক্রিম বানাব!

গুটুলি জিজ্ঞেস করল, বরফ কোথায় পাবে?

রণজয় বলল, পৃথিবীতে কি বরফের অভাব আছে? কত পাহাড়—!

যে জঙ্গলে ওরা থাকে, তার পেছনে পাহাড় আছে বটে কিন্তু সেখানে বরফ নেই। বরফের টুপি-পরা পাহাড় অনেক দূরে।

গুটুলিকে কাঁধে নিয়ে রণজয় একটার পর একটা পাহাড় পেরিয়ে যেতে লাগল। ওদের তো আর কোনো কাজ নেই। এখন আইসক্রিম বানাবার ঝোঁকটা পেয়ে বসেছে।

বরফের পাহাড়ে পৌঁছল পর দিন সন্ধ্যেবেলা।

কোথাও কোনো জন-মনুষ্য নেই, জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে জমে আছে বরফ। শীতকাল, তাই পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার দরকার নেই, অনেক নীচেই বরফ রয়েছে।

গুটুলিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রণজয় খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিল।

গুটুলি বলল, দোকানটা থেকে আমি এক তাল ছানাও নিয়ে এসেছি। এই নাও দাদা, ছানা খেয়ে গায়ে একটু জোর করে নাও।

রণজয় বলল, তুই খা। ছানা খেতে আমার বিচ্ছিরি লাগে। আমি আইসক্রিম বানিয়ে তবে খাব।

কী করে আইসক্রিম বানাতে হয়, জানো?

খুব সোজা। দুধটা ফুটিয়ে ক্ষীরের মতন করতে হবে, তার মধ্যে চিনি আর বরফ মেশালেই দেখবি চমৎকার আইসক্রিম হয়ে যাবে। কুলপি-মালাইও হতে পারে। যা চাইবি।

দুটো সমান সাইজের পাথর যোগাড় করে উনুন বানাল রণজয়। গুটুলি কিছু শুকনো কাঠ-কুটো এনে গুঁজে দিল তাতে। আগুন জ্বালিয়ে ডেকচিটা চাপান হলো।

কাঠগুলো ভিজে, তাই আগুন নিভে যাচ্ছে বারবার।

গুটুলি মাটিতে শুয়ে পড়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে আবার আগুন ধরাচ্ছে। রণজয় চেয়ে আছে সামনের দিকে। হঠাৎ সে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল।

কাছেই খোলা জায়গায় জমে আছে চাপ চাপ বরফ। একটু একটু জ্যোৎস্না পড়েছে তার ওপর। চাই চাই বরফ যেন আপনা আপনি শূন্যে উঠে যাচ্ছে। এ আবার কী ব্যাপার?

রণজয় ভালো করে লক্ষ্য করল।

এবার দেখতে পেল, একটা মস্ত বড় লোহার হাত যেন মুঠো মুঠো করে সেই বরফ তুলে নিচ্ছে।

অন্য যে-কেউ এ দৃশ্য দেখলে ভয় পেত। কিন্তু রণজয়ের ভয় ডর নেই। সে বলল, গুটুলি, তুই দুধটা জ্বাল দে, আমি একটু আসছি।

রণজয় আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

তার চোখের ভুল নয়, সত্যিই একটা প্রকাণ্ড লোহার হাত বরফ তুলে নিয়ে যাচ্ছে পেছন দিকে।

রণজয় বুঝতে পারল, এটা একটা রোবটের হাত। হাতটা যদি এত বড় হয়, তাহলে রোবটটা কত বড়।

রণজয় আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। রোবটটাকে দেখতে পেল না, আবছা আলোয় তার চোখে পড়ল খানিকটা সমতল জায়গার ওপর রয়েছে একটা গোলমতন রকেট। সেই রকেটের ভেতর থেকে লোহার হাতটা বেরিয়ে এসে বরফ তুলছে, তুলে ফেলে দিচ্ছে রকেটের মধ্যে।

বাইরে থেকে কারা যেন বরফ চুরি করতে এসেছে!

কোনো মানুষ বা অন্য ধরনের প্রাণীদের দেখা যাচ্ছে না, শুধু যেন রকেটের কাছাকাছি কয়েকটা জোনাকি জ্বলছে আর নিভছে। বেশ বড় ধরনের জোনাকি।

গুটুলি একা থাকতে ভয় পায়। বরফ তোলার শব্দ শুনে সেও ছুটে এল রণজয়ের কাছে। ব্যাপারটা দেখে সে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, দাদা, এটা কী হচ্ছে?

রণজয় বলল, রাত্তিরের অন্ধকারে পৃথিবীতে কত কী যে ঘটে যা মানুষ টেরও পায় না। বুঝতে পারছিস না, অন্য কোনো গ্রহের প্রাণী এসে আমাদের বরফ নিয়ে যাচ্ছে। এই রকম ভাবে বোধহয় গাছপালা নদীও নিয়ে যায়। আজকাল প্রায়ই শুনিস না, জঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে নদী মরে যাচ্ছে, সে সব এদেরই কীর্তি!

গুটুলি বলল, দাদা, পালিয়ে চলো। অত বড় লোহার হাত।

রণজয় বলল, ভয়ের কী আছে। এই চুরি আটকাতে হবে না?

রণজয় তার বজ্রের মতন গম্ভীর গলায় হুঙ্কার দিল, এই, কে রে? কে বরফ চুরি করে?

সঙ্গে সঙ্গে সেই লোহার হাত এদিকে ঘুরে এল। একসঙ্গে রণজয় আর গুটুলিকে মুঠোয় ভরে তুলে নিল শূন্যে। রণজয়ের শরীরে অসীম শক্তি, তবু সে ছাড়াতে পারল না নিজেকে। লোহার হাতটা ওদের ছুঁড়ে দিল রকেটের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান ফেরার পর রণজয় ধড়মড় করে উঠে বসল। সে শুয়েছিল খোলা আকাশের নীচে। গুটুলি ঘুমিয়ে আছে তার পাশে। ঠিক রোদ্দুরও নয়, ছায়াও নয়, একটা আবছা মতন আলো রয়েছে চারদিকে। আকাশের রং কালো। মেঘলা আকাশ যে-রকম কালো হয়, সে রকম নয়, সম্পূর্ণ আকাশটা স্লেট রঙের।

রণজয়ের বুঝতে দেরি হল না যে তারা একটা অন্য গ্রহে এসে পড়েছে। তাতেও রণজয় ভয় পেল না। এরকম অভিজ্ঞতা তার আগেও অনেকবার হয়েছে।

গুটুলির দিকে সে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। এই বেঁটে লোকটিকে সে চেনে বটে, কিন্তু কিছুতেই ওর নাম মনে করতে পারছে না। রণজয়ের নিজেরই বা নাম কী? তাও মনে নেই।

গুটুলিও উঠে চোখ রগড়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এটা কোন জায়গা?

রণজয় বলল, সেটা পরের কথা। আমাকে তুমি চেনো?

গুটুলি বলল, বাঃ তোমাকে চিনব না কেন? এ কী জিজ্ঞেস করছ। তুমি তো তুমি!

আমার নাম কী?

তোমার নাম? তাই তো, তাই তো, মনে পড়ছে না।

হুঁ! আমরা কোথা থেকে এসেছি মনে আছে?

আমরা কোথা থেকে এসেছি? এই যাঃ জানি না তো! তুমি বলে দাও।

আমরা কোথা থেকে এসেছি তাও মনে নেই? এই জায়গাটা অচেনা লাগছে, তা
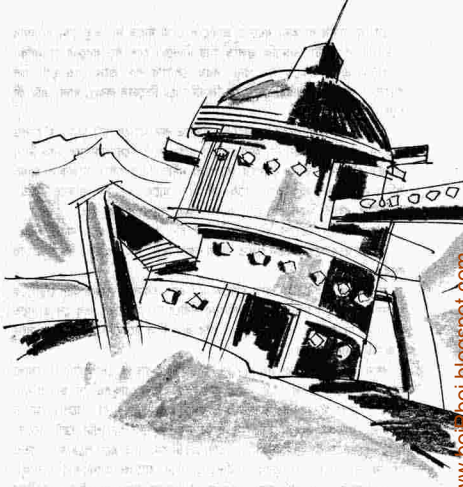
হলে নিশ্চয়ই আমরা অন্য কোথাও ছিলাম। সেই জায়গাটা কেমন?

কিচ্ছু মনে পড়ছে না যে!

রণজয় এবার একটু দমে গেল। কোন জায়গা থেকে এসেছে, তাই-ই যদি মনে না থাকে, তা হলে ফিরবে কী করে?

গুটুলি একটুখানি সামনে ঘুরে এল। কোনো গাছ বা প্রাণী কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মাটিটা নরম, কিন্তু কাদা নেই।

গুটুলি বলল, খিদে পেয়েছে। কতদিন ভাত খাইনি। গরম গরম ভাত.....

রণজয় বলল, ইস্, আইসক্রিম খাওয়া হলো না।

সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মতন কাণ্ড ঘটল। কোথা থেকে দুটো থালা ফুটে উঠল

ওদের সামনে। তার একটাতে ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত। আর একটাতে আইসক্রিম।

ওদের একেবারে চক্ষু ছানাবড়া!

রণজয় বলল, আমাদের নাম মনে নেই। কোথা থেকে একসঙ্গে এসেছি তা মনে নেই। কিন্তু ভাত আর আইসক্রিমের কথা মনে থাকল কী করে?

গুটুলি বলল, কী জানি।

ভাতের সঙ্গে আর কী খায়?

মনে নেই। এগুলো কে দিয়ে গেল?

তা কী করে জানব।

ভাতটা গরম, আইসক্রিমটা ঠাণ্ডা। এ দুটোকে কি একসঙ্গে খায়?

তাও জানি না।

খিদে পেয়েছে, খেয়ে তো নিই।

গুটুলিই আগে ভাতের সঙ্গে আইসক্রিম মিশিয়ে দলা পাকিয়ে মুখে দিয়ে বলল, আঃ! চমৎকার!

দু'জনে খুব তাড়াতাড়ি সবটা শেষ করে ফেলল।

তারপর দু'জনই হেঁটে দেখতে লাগল জায়গাটা। রণজয়ের বুকটা ফাঁকা ফাঁকা আর হাল্কা লাগছে। অনেক কথা তার মনে নেই। ভাত আর আইসক্রিম ছাড়া আর একটা খাবারের কথাও মনে পড়ছে না। অন্য কোনো মানুষের মুখ মনে পড়ছে না। জঙ্গল বা পাহাড়ের কথা মনে পড়ছে না।

এই গ্রহটা একেবারে সমতল। মানুষের থাকার মতন কোনো বাড়ি-ঘর চোখে পড়ছে না। অনেক দূরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কয়েকটা কারখানা আছে মনে হলো। মাঝে মাঝে শূন্য দিয়ে উড়ে যাচ্ছে রকেট। কয়েকটা অদ্ভুত ধরনের গাড়িও চলে গেল ওদের পাশ দিয়ে, কিন্তু তার যাত্রীদের দেখা যাচ্ছে না। শুধু ভেতরে জোনাকির মতন আলো জ্বলছে আর নিভছে।

খানিকটা দূরে একটা মাঠের মধ্যে ঘুরছে কয়েকটা গরু, ছাগল, ঘোড়া, জিরাফ, জেব্রা, খরগোশ আরও অনেক জন্তু, যা ওরা আগে কখনও দেখেনি। গরু-ছাগল-ঘোড়াগুলো দেখে ওরা চিনতে পারলেও তাদের নাম মনে নেই।

রণজয় একটা গরুর দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, এটা কী?

গুটুলি বলল, এটা, এটা, এটা, তাই তো কী এর নাম?

রণজয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমরা অনেক কিছু ভুলে গেছি। এ কোন এক ভোলার দেশে এসে পড়লাম।

সেখানে ওদের কেটে গেল তিন দিন।

মাটিতেই শুয়ে থাকতে কোনো অসুবিধে নেই। এখানে রোদ ওঠে না, বৃষ্টি পড়ে না। যে-কোনো জায়গায় গেলে কেউ বাধা দেয় না।

ওরা খায় শুধু গরম ভাত আর আইসক্রিম। খিদে পেলে ঐ দুটোর কথাই মনে পড়ে অমনি দুটো থালা ভর্তি চলে আসে।

রণজয় বুঝতে পেরেছে যে এই গ্রহের অধিবাসীদের মানুষের চোখের লেন্সে দেখা যায় না। মানুষের কাছে তারা অদৃশ্য। শুধু তাদের চোখগুলো জোনাকির মতন জ্বলে-নেভে।

এখানে ইচ্ছেশক্তির খুব জোর আছে। ইচ্ছেটাই বস্তু হয়ে যায়। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, স্মৃতিশক্তি এমনই কমে যায় এখানে যে বেশি কিছু স্মৃতিতে থাকেই না।

এখানে থাকার কোনো অসুবিধে নেই। যেখান থেকে এসেছে, সেই পৃথিবীর কথা ওদের একটুও মনে নেই, তবু বুকের মধ্যে টনটন করে। কিসের যেন একটা

দুঃখ ঘুমের মধ্যেও ওদের সঙ্গে থাকে।

এখানকার মাটি নরম। হাত দিয়ে দাগ কাটা যায়। গুটুলি একদিন নানা রকম দাগ কাটছে, হঠাৎ রণজয় বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, এই যে তিনটে দাগ কাটলে এটা কিসের মতন দেখাচ্ছে বলো তো!

গুটুলি বলল, জানি না তো!

রণজয় বলল, একটা সোজা দাগ, আর বাঁ পাশে দুটো দাগ কোনাকুনি জোড়া। এটা হলো ব।

ব? তার মানে কি?

ব হলো একটা অক্ষর। আমরা যে কথা বলি, তার ব।

ঠিক তো। আমরা যে কথা বলি, তা লেখাও যায়। ব, তারপর কী?

মনে করতে পারছি না।

ব-এর পাশে একটা হাতের মতন দিলে ক হয় না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ক। ঠিক। ক-এর মানে কী?

তা তো জানি না। তা হলে দুটো পেলাম, ব আর ক। বক। বক। খুব চেনা চেনা লাগছে। বক বলে কিছু একটা আছে না?

হ্যাঁ, আছে। ওড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বক ওদের সামনে দিয়ে উড়ে গিয়ে মাটির ওপর বসল।

ওরা দু-জন তাকাল পরস্পরের দিকে। এবার স্পষ্ট হয়ে গেল যে এখানে যে-কোনো জিনিসের নাম উচ্চারণ করলেই সেটা বাস্তব হয়ে উঠবে। সেদিন আর কিছু মনে পড়ল না।

পরদিন সকাল থেকে প্রবল উদ্যমে মাটিতে দাগ কাটতে লাগল রণজয়। বারবার লিখছে ব আর ক, বক, বক। আর প্রত্যেকবার ম্যাজিকের বক উড়ে যেতে লাগল সেখান দিয়ে।

অনেক আঁকিবুকি কাটার পর আবার একটা অক্ষর চিনতে পারল রণজয়। ন।

গুটুলিও বলল, ন। হ্যাঁ, ন!

রণজয় ক-এর পাশে ন বসাল। তারপর কন। কন মানে কি?

গুটুলি বলল, তা তো জানি না! তুমি ব-এর পাশে বসাও তো!

রণজয় সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো, বন বন! বন মানে জানিস তো!

গুটুলি বলল, জানি, জানি! বড় বড় গাছপালা। আমরা সেখানে ছিলাম।

ঠিক বলেছিস, গাছ! গাছ খুব লম্বা হয়। অনেক হাত থাকে।

ঐ দ্যাখো। একটা গাছ!

যেমন ভাবে বক উড়ে গিয়েছিল, সেই রকমভাবে পরপর কয়েকটা গাছ গজিয়ে গেল সামনে। গজাতেই লাগল, একটা বন হয়ে গেল।

রণজয় বলল, বন কোথায় ছিল। ভাব তো। সেটা অন্য গ্রহ। সেটার নাম কী?

গুটুলি বলল, বনের পাশে ছিল পাহাড়। বরফ!

রণজয় শূন্যে এক লাফ দিয়ে বলে উঠল, মনে পড়েছে। পৃথিবী। পৃথিবীতে বরফ থাকে। বন থাকে। মানুষ থাকে। গরু-ছাগল-ঘোড়া থাকে। সব হয়ে যাক।

তক্ষুণি বিরাট এক গর্জন শোনা গেল। যেন শত শত বজ্রপাত হচ্ছে। মাটি দুলছে। রণজয় আর গুটুলি চোখে অন্ধকার দেখল, চোখ ঢেকে শুয়ে পড়ল।

খানিকবাদে থেমে গেল সব আওয়াজ। মাটিও আর কাঁপছে না।

চোখ মেলল ওরা দু'জন।

আবার বিষম অবাক হবার পালা। ওদের সামনে তৈরি হয়ে গেছে এক পাহাড়। তার গায়ে কিছু কিছু জঙ্গল। সামনে ছড়ান আছে বরফ।

একটা ডেকচিতে দুধ ফুটছে।

রণজয় বলল, তোর নাম তো গুটুলি। আমার নাম রণজয়। মনে পড়ে গেছে। দ্যাখ গুটুলি, এই জায়গাটা আমাদের পৃথিবীর মতন হয়ে গেল।

গুটুলি বলল, দাদা, এটা কি অন্য গ্রহ? নাকি আমাদের সেই পৃথিবীটাই? দ্যাখো, দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি পর্যন্ত পড়ে আছে। আমরা তো দেশলাইয়ের কথা বলিনি।

রণজয় বলল, তাই তো! তাহালে কি ওরা আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে গেল?

গুটুলি বলল, ফিরিয়ে দিল? আমরা কি কোথাও গিয়েছিলাম, না এখানেই ছিলাম? তিন চার দিন ধরে কী এই দুধ ফুটছে? অথচ কত আইসক্রিম খেলাম।

রণজয় বলল, আমার আঙুলের কোণে ভিজে ভিজে মাটি কেন? আমি মাটিতে আঁকিবুকি কাটছিলাম। এখানে তো মাটি নেই, শুধু পাথর। তা হলে?

গুটুলি বলল, কী জানি দাদা, কিছুই বুঝতে পারছি না।

ওরা বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে।

মাঝরাতের অতিথি

মাঝ রাত্তিরে অনেকগুলো কুকর এক সঙ্গে ডাকছে। সেই ডাক শুনে সনাতন গোস্বামীর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

গ্রামের একেবারে এক প্রান্তে সনাতনের বাড়ি। বাড়ি মানে দু'খানা খড়ের ছাউনির মাটির ঘর আর সামনে এক চিলতে দাওয়া। বৃদ্ধ সনাতন আর তার বউ মানদা ছাড়া সে বাড়িতে আর কোনো তৃতীয় প্রাণী নেই।

মানদা ঘুমিয়ে আছে, সনাতন উঠে বসল। এত কুকুর ডাকছে কেন? ডাক শুনে মনে হয় কুকুরগুলো কারুকে তাড়া করেছে। চোর এল নাকি? কিংবা বাঘডাসা? বাঘডাসা ঠিক বাঘ নয়, নেকড়ের মতন একরকম প্রাণী, গায়ে সাদা সাদা ছোপ আছে। ওরা হাঁস-মুরগী চুরি করতে আসে।

সনাতনের বাড়ির পরেই বিস্তীর্ণ জলাভূমি, তার মাঝে ঝোপ-জঙ্গলও রয়েছে, সেখানে নানা রকম জন্তু জানোয়ার আছে।

চোর হলেও চিন্তার কিছু নেই। কারণ সনাতনের বাড়িতে কোনো চোর ভুল করেও ঢুকবে না। ঢুকলে তার পরিশ্রমটাই নষ্ট।

সনাতন বৈষ্ণব মানুষ। সে হাঁস-মুরগী পোষে না, সুতরাং বাঘডাসাও আসবে না। তবু মাঝরাতে এ রকম কুকুরের ডাক শুনলে গাটা ছমছম করে।

কুকুরগুলো প্রায় ঘরের পাশে চলে এসেছে আর হিংস্র ভাবে গর্জন করছে। সনাতন চৌকি থেকে নেমে পড়ল। তার বাড়ির দরজাটা খুব পলকা, কেউ জোরে ধাক্কা মারলে খুলে যাবে। যে রাতে খুব ঝড় বৃষ্টি হয়, সেই সব রাতে সনাতন তার টিনের সুটকেশটা টেনে এনে দরজার সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখে। অন্য রাতগুলোতে দরকার হয় না। এই গরীব বুড়ো-বুড়ির কাছে রাত্তির বেলা তো কেউ আসবে না।

সনাতনের একটি মাত্র ছেলে ছিল। অনেকদিন আগে সে নদীতে ভেসে গেছে। তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। ওদের আর কেউ নেই। সনাতন গান গেয়ে সংসার চালায়। তা বলে সে ভিক্ষে করে না। প্রত্যেক দিন ভোরবেলা সে গ্রামের পথ দিয়ে ভগবানের গান গাইতে গাইতে যায়।কোনো বাড়ির দরজার সামনে থামে না। তার গান শুনে অনেকের ঘুম ভাঙে। মাসের প্রথমে গ্রামের লোকেরা নিজে থেকেই তার বাড়িতে কিছু কিছু চাল, ডাল, ফল-তরকারি আর দু'একটি করে টাকা পৌঁছে দিয়ে যায়। সনাতন একটু একটু কবিরাজি চিকিৎসাও জানে। আগে তার কাছে কিছু কিছু লোক আসত। কিন্তু এখন পাশের গ্রামে একজন নতুন পাশ করা ডাক্তার

এসেছে বলে সনাতনের চিকিৎসার ওপরে কেউ ভরসা করে না।

হুড়মুড় করে একটা শব্দ হলো। কী যেন একটা বেশ বড়সড় প্রাণী দরজা ঠেলে ঢুকে পড়েছে পাশের ঘরে। সেই শব্দে মানদারও ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে ভয়ে চিৎকার করে উঠল, কে? কে?

পাশের ঘরে কোনো জন্তু ঢোকেনি, ঢুকেছে একজন মানুষ। মানদার চিৎকারের উত্তরে পাশের ঘর থেকে শোনা গেল, চুপ! চুপ!

যে ঢুকেছে সে বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর দু'ঘরের মাঝখানের দরজাটায় এসে দাঁড়াল। অন্ধকারের মধ্যেও বোঝা গেল একজন বিশাল চেহারার লোক। সে ধমকের সুরে বলল, চুপটি করে থাকো, কোনো শব্দ করবে না! গোঁসাই এদিকে এস, বাতি জ্বালো!

এ ঘরেই একটা তাকের ওপর কুপি আর দেশলাই থাকে। কিন্তু কুপি জ্বালতে গিয়ে সনাতনের হাত থরথর করে কাঁপতে লাগল। এ রকম ঘটনা তো আর জীবনে আগে ঘটেনি। ছেলেটা নদীতে ভেসে যাবার পর তার জীবনে আর কোনো ঘটনাই ঘটে নি।

সনাতনের চেয়ে মানদার সাহস বেশি। সে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? মাঝরাতে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়লে?

ছায়ামূর্তি কর্কশ গলায় বলল, আমি কে তা জেনে তোমার দরকার নেই। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, আমি যা বলছি তাই করো। বিছানা থেকে ওঠো, ঘরে কি খাবার আছে, বার করো!

আট দশটা দেশলাই-এর কাঠি নষ্ট করে সনাতন কুপিটা জ্বালল।

সেই আলোতে মানুষটাকে দেখে আরও ভয় লেগে গেল। সাঙ্ঘাতিক চেহারা! মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ, চোট দুটো জ্বল জ্বল করছে, সারা গায়ে জল-কাদা মাখা, তার ডান হাতে একটা মস্ত বড় ছোরা। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে এক ঠ্যাঙে, আর একটা পা মোড়া, সেই পায়ের উরুর কাছে জমাট বেঁধে আছে রক্ত।

লোকটা ছুরিটা তুলে বলল, টুঁ শব্দ করলে খুন করে ফেলব! আমার পায়ে গুলি লেগেছে, তিনদিন জল-কাদার মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম। গোঁসাই তোমার কি ওষুধ পত্তর আছে লাগিয়ে দাও। আর ঘরে কী খাবার আছে শিগগির আনো, খিদেয় আমার নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাচ্ছে!

লোকটা বোধহয় এতখানি হেঁটে এসেছে মনের জোরে। এবারে সে দরজার চৌকাঠের সামনেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল কাৎ হয়ে, ছুরিটা রাখল মাথার কাছে। তারপর ফিস ফিস করে বলল, আমার সঙ্গে কোনো রকম চালাকি করার চেষ্টা করো না। এখনও গায়ে যে-টুকু শক্তি আছে তাতে তোমাদের মতন দুটো বুড়ো বুড়িকে সাবাড় করে ফেলতে পারব।

সনাতন এবারে কাতরভাবে বলল, বারবার ওকথা বলছ কেন, বাবা! আমাদের মারলেই বা কী আর না মারলেই বা কী! আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছ,

আমরা যে-টুকু পারি সেবা করব!

লোকটি বলল, আমার পায়ে অসহ্য ব্যথা। ওষুধ দাও!

সনাতন এবারে এগিয়ে এসে লোকটির উরু পরীক্ষা করে দেখল । যে-খানে গুলি ঢুকেছে সেখানে কুচিকুচি মাংস আর পুঁজ জমে এর মধ্যেই থকথকে ঘা হয়ে গেছে। গুলিটা বেরিয়ে গেছে না ভেতরেই রয়েছে তাই-বা কে জানে। সনাতনের অত বিদ্যে নেই।

সনাতন বলল, এর চিকিৎসা আমি কি করব বাবা? এ যে অনেক বড় ব্যাপার। পাশের গ্রামে ভালো ডাক্তার আছে, তুমি তার কাছে যাও! যদি বল তো, আমি তোমাকে ধরে ধরে নিয়ে যেতে পারি।

লোকটি বলল, চুপ! ওসব কথা শুনতে চাই না। তুমি যা পারো শিগগির করো!

সনাতনের কাছে খানিকটা পুরনো মলম আছে, তা-ই লাগিয়ে দিতে হবে। সে আগে জলের কুঁজো এনে ক্ষতস্থানটা ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করতে লাগল।

লোকটা যে কে তা এতক্ষণে সনাতন বুঝে গেছে। তিন রাত আগে এখান থেকে খানিকটা দূরে খলসেখালি গ্রামে দারুন ডাকাতি হয়েছে। তবে ডাকাতরা নিশ্চিন্তে লুটপাট চালাতে পারে নি। ডাকাতরা দু'জন লোককে মেরে প্রচুর জিনিসপত্র নিয়ে যখন পালাবার উপক্রম করছে, তখন পাশের গ্রামের জমিদার হরবল্লভ রায় আর তাঁর ভাই ঘোড়ায় চেপে বন্দুক নিয়ে উপস্থিত। তাদের গুলি খেয়ে একজন ডাকাত সেখানেই মারা যায়, দুজন আহত অবস্থায় ধরা পড়ে, আর বাকিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালায়।

এই লোকটা নিশ্চয়ই সেই পলাতক ডাকাতদেরই একজন। এই ক'দিন জলায় জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল।

মানদা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

লোকটি বলল, কই, খাবার দিলে না?

মানদা বললে, ও ঘরে যেতে হবে। যাব কী করে?

লোকটি বললে, আমায় ডিঙিয়ে যাও!

মানদা বললে, জ্যান্ত মানুষকে কেউ ডিঙিয়ে যায় নাকি? সে আমি পারব না!

লোকটি চোখ কটমট করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল, তারপর অতি কষ্টে মাথাটা সরাল। সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল মানদা।

লোকটি সনাতনকে বলল, তোমার বউকে ডেকে দাও, সে যদি বাইরে বেরিয়ে গিয়ে গ্রামের লোকদের ডেকে আনে, তাহলে কিন্তু তুমি বাঁচবে না। এই বাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেব। তারপর আমার যা হয় হবে?

সনাতন বলল, তুমি কথায় কথায় খুনোখুনির কথা বলছ । আমরা স্বামী-স্ত্রীতে কোনোদিন একটা পিঁপড়েও মারিনি! তুমি খাবার চেয়েছ ও ঠিক খাবার এনে দেবে!

ক্ষতটা পরিষ্কার হয়েছে কোনো মতে। এবারে মলম লাগাতে হবে।
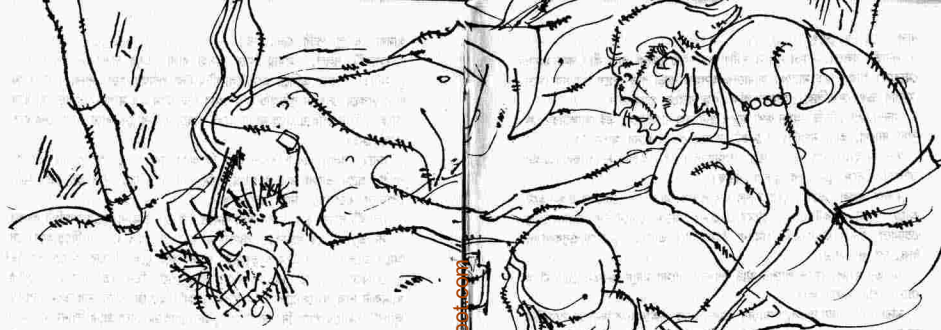
চৌকিটার নীচেই সনাতন তার ওষুধ-পত্তর রাখে। সেখানে মাথা গলিয়ে সে মলম খুঁজতে লাগল।

লোকটা আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। সে বিকৃত গলায় বলল, কই গো, গোঁসাই, এত দেরি হল কেন? তোমার বউ খাবার নিয়ে এল না!

সনাতন বললে, এই যে আসছি, আসছি!

ওষুধ নিয়ে এসে সনাতন ক্ষতস্থানে লাগাতেই লোকটি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। সে বলতে লাগলো, উঃ, জ্বলে গেল! জ্বলে গেল! ও গোঁসাই কী লাগালে?

সনাতন বলল, ওষুধে তো একটু জ্বালা করবেই বাবা! একটু পরে কমে যাবে।

সনাতন এক টুকরো কাপড় দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল সেই জায়গাটায়। মানদা একটা কলাই করা থালায় খানিকটা খই আর একটু পাটালি গুড় এনে বলল, এখন এই খেয়ে নাও। কাল সকালে ভাত রেঁধে দেব!

লোকটি অদ্ভুত চোখে মানদার দিকে তাকিয়ে বললে, কাল সকালে? হেঃ! ততক্ষণ আমি থাকছি আর কি! সূর্য ওঠার আগেই আমাকে সট্‌কে পড়তে হবে। দাও দাও, কী আছে দাও!

সেই খই জলে ভিজিয়ে তাতে পাটালি গুড় মেখে লোকটা হ্যাংলার মতন গপ্ গপ্ করে খেতে লাগল।

কিন্তু সবটা সে খেতে পারল না। হঠাৎ তার মাথাটা ঢলে পড়ল। চোখ দুটো গেল বুঁজে।

মানদা বললে, আহা রে। ঘুমিয়ে পড়েছে। শরীরের ওপর এত ধকল সহ্য হবে

কেন? থাক, জেগে উঠে বাকিটা খাবে।

সনাতন বলল, ঘুমোয় নি। অজ্ঞান হয়ে গেছে!

মানদা বলল, এই লোকটা একটা ডাকাত, না গো?

সনাতন বলল, তাতে আর সন্দেহ আছে? দেখছ না মুখখানা একেবারে রাক্ষসের মতন।

মানদা বলল, ঘুমোলে কিন্তু সব মানুষেরই মুখ সরল দেখায়!

সনাতন লোকটির হাত থেকে ছুরিটা খুলে নিয়ে চৌকির তলায় সরিয়ে রাখল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, একটা খুনে! পাপী! শিলের নোড়াটা এনে ওর মাথাটা ছেঁচে দিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়!

মানদা আঁৎকে উঠে বলল, সে কি! তুমি লোকটাকে মেরে ফেলার কথা ভাবছ

নাকি? সে কি গো?

সনাতন বললে, একটা নৃশংস খুনী! ওর বেঁচে থেকে লাভ কী? কত মানুষ মেরেছে। আরও কত মারবে। আমাদের অসহায় বুড়ো বুড়ি পেয়ে কতবার মেরে ফেলার ভয় দেখাচ্ছিল। আমরা বুঝি কিছু করতে পারি না?

মানদা বলল, ছি ছি, অমন কথা মনেও স্থান দিও না। হ্যাগো, এই লোকটার চোখ দুটো দ্যাখো, আর নাকটা? অনেকটা আমাদের খোকনের মতন নয়?

সনাতন বলল, যাঃ কী যে বলো। আমাদের খোকন অনেক সুন্দর ছিল। একটা ডাকাতের সঙ্গে তুমি ওর তুলনা করছ?

মানদা বলল, একেও দেখতে খুব খারাপ নয়। মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল হয়ে আছে! আচ্ছা, লোকটা তো এ গ্রামের কেউ নয়। একে কোনোদিন দেখিনি। কিন্তু তোমাকে চিনল কী করে? তোমাকে গোঁসাই বলে ডাকছে। তুমি যে ওষুধ-পত্তর দাও, তা ও জানে!

সনাতন বলল, আশে পাশের আট দশখানা গ্রামের মানুষ সনাতন গোস্বামীকে চেনে। তুমি ভাবো কী?

মানদা ধরা গলায় বলল, আমাদের খোকন বেঁচে থাকলে এত দিন এত বড়োটিই হতো। হ্যাঁ গো, আমাদের খোকনই ফিরে আসেনি তো? নদীতে ভেসে গিয়েছিল, হয়তো মরে নি। কোন দূর দেশে গিয়ে উঠেছিল।

সনাতন বলল, কী যে বলো তুমি! তা কখনও হতে পারে? যদি বা বেঁচে থাকে আমাদের খোকন ডাকাত হবে কেন? বৈষ্ণবের রক্ত আছে তার গায়ে!

মানদা বলল, যদি কোনো খারাপ লোকের পাল্লায় পড়ে থাকে। হয়তো কোনো ডাকাতের বাড়িতেই সে মানুষ হয়েছে!

সনাতন বলল, থাক ওসব বাজে কথা। চলো আমরা শুয়ে পড়ি। খোকন যখন নদীতে ভেসে যায়, তখন তার চোদ্দ বছর বয়েস। যদি সে বেঁচে থাকত, তাহলে সে তখনই বাড়ি ফিরে আসতে পারত না? এই লোকটা খোকন হলে নিজের বাড়ি চিনতে পারত না? আমাদের ওরকম ধমকে ধমকে কথা বলবে! একটা ডাকাতকে তুমি নিজের ছেলে ভাবছ। হুঁঃ!

মানদা বলল, প্রথমে ওরকম কথা বলছিল, পরে নিশ্চয়ই সব খুলে বলতো! খুঁজে খুঁজে আমাদের বাড়িতেই এসেছে। তাছাড়া ওযে ডাকাত তা বুঝলে কী করে? যারা দেশের কাজ করে তাদেরও তো পুলিশে গুলি করে মারতে চায়। আহা, আমার কাছে খাবার খেতে চাইল ঠিক আমার খোকনের মতন। খোকন খুব পাটালি গুড় ভালোবাসতো।

হুঃ যত সব! বলে সনাতন ফুঁ দিয়ে কুপিটা নেভাতে যেতেই মানদা বলল, দাঁড়াও, একটা জিনিস দেখি। আমাদের খোকনের বাঁ কানের পেছনে একটা কাটা দাগ ছিল মনে আছে! সেই যে একবার বঁটি নিয়ে খেলা করতে গিয়ে কেটে গিয়েছিল! দ্যাখো তো এর সেই রকম দাগ আছে কিনা!

সনাতন বলল, ডাকাতের গায়ে কত রকম কাটা-ছেঁড়া দাগ থাকে। ওরকম মিল থাকলেই বা কি?

মানদা বলল তবু তুমি একবার দ্যাখো।

কুপিটা এগিয়ে অজ্ঞাত লোকটির বাঁ কানটা উল্টে দু'জনেই এক সঙ্গে দেখল। ঠিক সেখানে একটা কাটা দাগ! লোকটির মুখে বা গায়ে আর কোথাও কিন্তু কোনো কাটা দাগ নেই!

মানদা চেঁচিয়ে উঠল, এই তো খোকন, এ নিশ্চয়ই আমাদের খোকন।

সনাতনও আর ঠিক অবিশ্বাস করতে পারল না। কাঁপতে কাঁপতে সে কুপিটা নামিয়ে রাখল। জল গড়িয়ে পড়ল তার চোখ দিয়ে। দু'হাত জোড় করে সে মুখটা উঁচু করে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, ঠাকুর তুমি আমায় রক্ষা করেছ। তুমি আমায় বড় বাঁচা বাঁচিয়েছো।

মানদা আনন্দে চ্যাঁচামেচি করছে তবু সনাতন কোনো সাড়া দিচ্ছে না। তখন মানদা অবাক হয়ে সনাতনের দিকে তাকাল। আর তখনই তার নজরে পড়লো সনাতনের পাশে রাখা ছোট্ট হোমিওপ্যাথি শিশিটা।

সে হাহাকার করে বলে উঠল, একি? তুমি ওষুধে বিষ মিশিয়ে দিয়েছ নাকি? হায়, হায়, কী সর্বনাশ করেছ! আমাদের খোকন!

সনাতন এবারে মানদার হাত চেপে ধরে বলল, না, দিই নি, বিশ্বাস করো দিই নি। একবার দিতে ইচ্ছে করছিল সত্যি কথা বলছি! কিন্তু পাপের ভয়ে দিতে পারি নি।

সত্যি বলছ দাওনি।

সত্যি দিই নি!

ঐ ছোট্ট শিশিটায় রয়েছে কেউটে সাপের বিষ। একবার গ্রামের ছেলেরা একটা কেউটে সাপকে মারছিল, তখন সনাতন তার বিষ দাঁতটা কামিয়ে বিষটা জমিয়ে রেখেছিল। সূচের ডগায় সামান্য একটু ঐ বিষ অনেক সময় মুমূর্ষু রোগিদের খাইয়ে দিলে তারা বেঁচে ওঠে। কিন্তু মলমের মধ্যে ঐ বিষ মিশিয়ে দিয়ে সেই মলম কাটা জায়গায় লাগালে নির্ঘাৎ মৃত্যু।

মানদা বলল, খোকনকে ডাকো! ওর জ্ঞান ফিরিয়ে দাও।

সনাতন বলল, দাঁড়াও, আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরবে। খোকন সত্যিই ফিরে এসেছে? খোকনের সঙ্গে এর মুখের অনেক মিল আছে তো সত্যি!

মানদা বলল, আমার খোকন কিছুতেই ডাকাত হতে পারে না। আহারে ছেলেটা কত কষ্ট পেয়েছে! বুকটা একেবারে কাদায় মাখামাখি!

মানদা একটা গামছা এনে লোকটির বুকের কাদা মুছে দিতে লাগল। মুছতে মুছতে হঠাৎ এক সময় বলল, দ্যাখো তো, এটা কি?

সনাতন ঝুঁকে পড়ে দেখল লোকটির বুকে একটা লাল, গোল দাগ। খুব ছোট গাড়ির চাকার মতন।

সনাতন বলল, এতো জড়ুল! জন্ম জড়ুল! খোকনের তো এরকম ছিল না।

মানদা ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করল, পরে হতে পারে না? সনাতন বলল, না, এতো জন্মের সময় থেকেই হয়, দাঁড়াও, আর একটা জিনিস দেখি তো।

সনাতন লোকটির মুখখানা ফাঁক করে দেখল। তারপর সনাতনের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সে বলল, এই দ্যাখো, এই লোকটার সব কটা দাঁত রয়েছে। খোকনের সামনের ওপরের একটা দাঁত ভাঙা ছিল না? নতুন করে তো দাঁত গজাবে না! এ আমাদের খোকন হতেই পারে না!

মানদার মুখখানি ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আপন মনেই বলে উঠল, যাঃ, খোকন নয়! খোকন ফিরে আসবে না!

সনাতন বলল, আর খোকনের কথা ভেব না। চলো শুয়ে পড়ি!

মানদা উঠে দাঁড়াতেই লোকটির বুকে বিচ্ছিরি শব্দ হতে লাগল। যেন গাড়ির চাকা চলছে। একটু পরে অ্যাঁক করে শব্দ হয়ে সব থেমে গেল।

সনাতন লোকটির ডান হাতের নাড়ি দেখে বলল, যাঃ, সব শেষ!

মানদা বললে, সব শেষ? না, না, না, ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করো। ওকে ঐটা দাও!

মানদা হাত দিয়ে ছোট শিশিটা দেখাল।

সনাতন বলল, কী বলছ পাগলের মতন কথা। ওটা দিলে এখন কী হবে? তাছাড়া ও মরেছে, আপদ গেছে! ও বেঁচে উঠলে আবার কী কাণ্ড করত কে জানে! হয়তো আমাদের মেরে রেখে যেত।

মানদা বলল, তা বলে শেষ চেষ্টা করবে না? ওকে ওটা একবার দিয়ে দ্যাখো অন্তত।

সনাতন বলল, আমি পারব না, আমার হাত কাঁপছে। তুমি যদি পারতো দাও।

মানদা বিছানার তলা থেকে একটা সূচ নিয়ে এল। সেটা বিষের মধ্যে ডুবিয়ে বার করে ফুঁ দিয়ে দিয়ে বেশিটা ঝরিয়ে নিল। তারপর সেই সূচটা ছোঁয়াল লোকটার জিভে।

কোনো কাজ হলো না। লোকটা একেবারে নিথর!

মানদা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সনাতন তার পিঠে হাত দিয়ে বলল, আর কাঁদছ কেন? যা হবার ভালোই হয়েছে, ও তো খোকন নয়। একটা ডাকাত!

মানদা বলল, তুমি কি ওর মলমে বিষ দিয়েছিলে? তাহলে এবার আর কোনো কিছুতেই কাজ হবে না!

সনাতন বলল, না দিই নি। সত্যি দিই নি। বিশ্বাস করো!

মানদা বলল, হ্যাঁ, তুমি বিষ দাওনি! তবু আমি কাঁদছি, ও খোকন না হলেও একজন মানুষ তো! চোখের সামনে একজন মানুষ মরে গেলে কাঁদব না?

মানদার চোখে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়তে লাগল লোকটার বুকের ওপর।

কেন দেখা দিল না

আমার বন্ধু শঙ্করকে গুয়াহাটি যেতে হয়েছিল অফিসের কাজে। আমিও তখন যাচ্ছিলাম দিল্লি হয়ে রাজস্থান। দু'জনে সম্পূর্ণ দু'দিকে যাব। দমদম এয়ারপোর্টে বসে গল্প করলাম খানিকক্ষণ। আমার প্লেন সাড়ে পাঁচটায় আর শঙ্করের প্লেন ছাড়বে সাড়ে ছ'টায়।

শঙ্কর বলল, "তুই রাজস্থানে ঘুরবি। শুনে আমার খুব লোভ হচ্ছে। অফিসের কাজ না থাকলে আমি তোর সঙ্গে চলে যেতাম।"

আমি বললাম "আমারও তো ওদিককার ট্রেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। না হলে দিল্লির বদলে ঘুরে আসতাম গুয়াহাটি।"

প্লেনে ওঠার জন্য আমারই আগে ডাক পড়ল।

শঙ্কর জিজ্ঞেস করল, "তুই কবে ফিরবি, সুনীল?"

আমি বললাম, "কুড়ি তারিখ শনিবার সকালে।"

শঙ্কর বলল, "আমি ফিরে আসব তার অনেক আগেই। তা হলে ওই কুড়ি তারিখ ফিরেই তুই আমার বাড়িতে চলে আসিস। তোর বেড়াবার গল্প শুনব। আর রাত্তিরে আমরা খাব একসঙ্গে।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে, ওই কথাই রইল।"

আমি চলে গেলাম প্লেনের দিকে। তারপর দিল্লি ছুঁয়ে রাজস্থানে ঘোরাঘুরি করলাম বেশ কয়েকদিন। ইচ্ছেমতন এক-এক জায়গায় থেকেছি। কোথায় কোন হোটেলে উঠছি, তা আমার বাড়ির কেউ জানত না, জানবার দরকারও বোধ করেনি।

ফিরে এলাম ঠিক কুড়ি তারিখেই। আরও কয়েকদিন থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আজকাল তো ট্রেনের টিকিট যে-কোনো সময় চাইলেই পাওয়া যায় না।

বাড়ি ফিরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি, দোতলার মুখে দাঁড়িয়ে আছে আমার ছোট ভাই। আমাকে দেখে তার মুখখানা যেন ছাই রঙের হয়ে গেল।

সে বলল, "দাদা, তুই খবরটা শুনেছিস?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী খবর?"

আমার ছোটভাই চুপ করে গেল। আমি দৌড়ে ওপরে উঠে এসে তাকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, "কী হয়েছে? কিছু বলছিস না কেন?"

শঙ্করদা মারা গেছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন আমার জ্ঞান চলে গিয়েছিল। মাথায় কিছু ঢুকল না।

তারপর আমি চিৎকার করে বললাম, "মিথ্যে কথা। হতেই পারে না।"

এই তো সেদিন দেখা হল শঙ্করের সঙ্গে। আমি বিদায় নেওয়ার সময় সে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, "কুড়ি তারিখে দেখা হবে। আমার চেয়েও শঙ্করের স্বাস্থ্য অনেক ভালো। সুন্দর চেহারা। সে কী করে হঠাৎ মরে যাবে?"

কিন্তু এক-একটা ঘটনা থাকে, চিৎকার করে প্রতিবাদ জানালেও মিথ্যে হয়ে যায় না। এইসব খবর নিয়ে কেউ মিথ্যে ঠাট্টাও করে না।

শঙ্কর সত্যিই নেই। গুয়াহাটিতে গিয়ে তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। কোনো চিকিৎসার আগেই তার শেষ নিঃশ্বাস পড়ে।

অন্য বন্ধুবান্ধবরা কেউ শঙ্করের মৃতদেহ দেখেনি। খবর পাওয়া গিয়েছিল প্রায় এক দিন পরে, কারণ টেলিফোনের লাইন পাওয়া যাচ্ছিল না। প্লেনে ফিরিয়ে আনার অনেক ঝামেলা। শঙ্করের মামা গুয়াহাটি চলে গিয়ে পোড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আমি সিঁড়ির ওপর বসে পড়লাম। আমার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়াতে লাগল। শঙ্কর আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তার সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হবে না? আজ কুড়ি তারিখ, শনিবার, আজ সে আমাকে নেমন্তন্ন করে রেখেছিল তার বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করার কথা। আজ আমি শঙ্করের মায়ের সামনে দাঁড়াব কী করে?

শঙ্করের মৃত্যুর পরেও তার চিঠি আসতে লাগল। ও খুব চিঠি লিখতে ভালোবাসত। পোস্টকার্ডে ছোট-ছোট চিঠি লিখত অনেককে। সেইসব চিঠি এসে পৌঁছতে লাগল অনেক পরে। সেইসব চিঠি দেখলেই বুকটা ধক করে ওঠে। মনে হয় না, মানুষটা বেঁচে আছে?

এয়ারপোর্টে শেষ দেখা শঙ্করের সেই চেহারা এখনও আমার চোখে ভাসে, তার কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাই।

তারপর কেটে গেল তিন মাস। শঙ্করের বাড়ির বৈঠকখানায় আমাদের বন্ধুদের একটা আড্ডা ছিল, এখন আর সেখানে কেউ যায়ই না। তবু প্রায়ই শঙ্করের কথা মনে পড়ে।

আমি আবার একটা নেমন্তন্ন পেলাম মানসের জঙ্গল ঘুরে দেখার। জঙ্গল আমার খুব প্রিয়। ডাক পেলেই ছুটে যাই। আর মানস ফরেস্ট তো অতি বিখ্যাত। থাকার ব্যবস্থা জঙ্গলের মধ্যেই, ডাকবাংলোতে।

তিন দিন ধরে সেই জঙ্গলে প্রচুর ঘোরাঘুরি করার পর একজন অসমিয়া বন্ধু আমাকে তার জিপ গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে গেল গুয়াহাটির সার্কিট হাউসে। সেখানে আমার নামে একটা ঘর বুক করা আছে।

কী একটা কারণে যেন অসমের সব সরকারি অফিসে স্ট্রাইক চলছে, তাই সার্কিট হাউসে খাবার পাওয়া যাবে না। অসমিয়া বন্ধুটি বাইরে থেকে একগাদা খাবার কিনে নিয়ে এল আমার জন্য।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর সে বিদায় নিল। রাত প্রায় সাড়ে দশটা। সারাদিন জিপ

গাড়িতে চেপে এসেছি বলে ধুলোয় গা একেবারে চিটচিটে হয়ে গেছে। তাই আমি স্নান সেরে নিলাম ভালো করে। তারপর খেতে বসলাম।

আজ আর ডাকলে বেয়ারাদেরও পাওয়া যাবে না। প্লেট, চামচ কিংবা এক গ্লাস জলও কেউ দেবে না। সবাই ছুটি নিয়েছে। সার্কিট হাউসে আর কোনো ঘরে কোনো লোক নেই। অত বড় সার্কিট হাউসটা একেবারে নিস্তব্ধ।

আমি একা থাকতে ভালোবাসি। হাতে একটা বই খুলে নিয়ে একা-একা খাওয়াটাও পছন্দ করি। যত ইচ্ছে সময় লাগুক, কেউ মাথা ঘামাবে না।

একখানা লুচিতে আলুর দম ভরে সবে মাত্র মুখে দিয়েছি, জানলার কাছে কিসের যেন একটা শব্দ হল। মুখ তুলতেই মনে হল, কে যেন জানলার পাশ দিয়ে চট করে সরে গেল।

আমি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, "কে?"

কেউ কোনো উত্তর দিল না। যতদূর জানি, আজ সার্কিট হাউসে কোনো লোক নেই। তা হলে কে দাঁড়িয়ে ছিল? কেউ থাকলেও লুকিয়ে পড়বে কেন? চোরটোর নাকি?

দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলাম। না, কেউ নেই। তা হলে আমারই ভুল হয়েছে। জানলার পরদাটা উড়ছে, সেই জন্যই ভুল হতে পারে।

ফিরে এসে বইটা তুলে নিয়ে খাওয়া শুরু করতেই আবার ঠকাস করে জানলার একটা পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল। এবার যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম, জানলার পাশ দিয়ে সরে গেল একটা মুখ।

আবার ধমকের সুরে চেঁচিয়ে বললাম, "কে? কে ওখানে?"

কোনো উত্তর নেই। চোখে এত ভুল দেখছি!

উঠে গিয়ে আবার দরজা খুলে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই। অন্য সব দরজায় তালা লাগানো, মাঝখানে লম্বা বারান্দা, চোর যদি হয় সে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে শব্দ করবে কেন? কেউ কি আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে!

এই লুকোচুরি কথাটা মনে আসতেই মনে পড়ল শঙ্করের কথা।

শঙ্কর এই গুয়াহাটিতে এসেই মারা গেছে। শঙ্করের বড়মামা ছাড়া আর আমাদের চেনাশোনা কেউ শঙ্করের মৃতদেহ দেখেনি। মামা-ভাগ্নেতে মিলে কোনো ষড়যন্ত্র করেনি তো? কোনও কারণে শঙ্কর গুয়াহাটিতে লুকিয়ে থেকে নিজের মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দিয়েছে?

কিন্তু শঙ্করের ছোট ভাই আর বোনকে আমি কী দারুণ কাঁদতে দেখেছি। শঙ্করের মা শোকে-দুঃখে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। মায়ের কাছে কি কেউ ছেলের নামে এমন মিথ্যে বলতে পারে? শঙ্করের বড়মামাও খুব গম্ভীর ধরনের মানুষ, তিনি এ-ধরনের নির্মম রসিকতা করতেই পারেন না।

নাঃ, শঙ্কর বেঁচে থাকতে পারে না।

আবার খাওয়া শুরু করলাম। এবার ঘরের মধ্যে একটা দমকা হাওয়া ঢুকে এল,

ঘরের একদিকের দেওয়ালে একটা জঙ্গলের ছবি, আর-একদিকের দেওয়ালে একটা ক্যালেন্ডার। হাওয়ায় ক্যালেন্ডারটা খুলে পড়ে গেল মাটিতে।

আমি ক্যালেন্ডারটা তুলবার জন্য উঠতে গিয়েও ভাবলাম থাক, খাওয়ার পর তুললেই হবে।

তখনই মনে পড়ল, আজকের দিনটাও শনিবার, আর এ-মাসের কুড়ি তারিখ। সঙ্গে-সঙ্গে আমার শরীরে একটা শিহরন বয়ে গেল।

আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, "শঙ্কর, শঙ্কর, তুই কি লুকিয়ে আছিস? আমার সামনে চলে আয়। আমাকে সব কথা বল।"

কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

তিন মাস আগেকার এক কুড়ি তারিখ, শনিবারে শঙ্করের সঙ্গে আমার খাওয়াদাওয়া করার কথা ছিল, আজও সেই রকম একটা দিন। শঙ্কর নেই। আজ কি আমি একা একা খেতে পারি?

খাবার সরিয়ে রেখে আমি বাথরুমে গিয়ে হাত ধুয়ে নিলাম। শঙ্করের জন্য বুকটা হু-হু করে উঠল।

বাথরুমের জানলা দিয়ে বাইরে দেখা যায় অন্ধকার একেবারে ঘুটঘুট করছে। পাশেই বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদী। জলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু নদীটা দেখা যাচ্ছে না।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি, ঝড়ের মতন হাওয়ায় জানলার পরদা উথালপাথাল করছে। এ-ঘরের সব দরজা-জানলায় বড়-বড় ভারী পরদা। এমন পরদা, যার আড়ালে কোনো মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে।

একেবারে ফাঁকা সার্কিট হাউস, চোর-ডাকাত ঢুকে পড়া অসম্ভব নয়। আমার কাছে টাকা-পয়সা প্রায় কিছুই নেই, কিন্তু চোর-ডাকাতেরা তা জানবে কী করে?

আমি সবকটা পরদা সরিয়ে-সরিয়ে দেখলাম। দরজায় লাগালাম খিল আর ছিটকিনি। কাছে জানালাগুলোতে শক্ত গ্রিল লাগানো আছে, কেউ ঢুকতে পারবে না।

বইটা পড়ার চেষ্টা করতেই ঝড়ের হাওয়ায় একটা জানলার পরদা খুব উড়তে লাগল। কাচের পাল্লা তো বন্ধ করেছিলাম, খুলে গেল কী করে?

উঠে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। ছিটকিনিটা একটু আলগা মতন, হাওয়ার ধাক্কায় নিজে-নিজেই খুলে গেছে। হাওয়া আসছে দারুণ জোরে। অন্য একটা জানলার পরদা সরিয়ে দেখলাম, তার দুটো পাল্লাই খোলা, এটা বোধ হয় বন্ধই করিনি।

এই প্রথম আমি ভয় পেলাম। একই দিকে দুটো জানলা। দুটোই নদীর দিকে। কিন্তু একটা জানলার পরদা দমকা হাওয়ায় উড়ছিল, আর অন্য জানলার পরদাটা একটুও নড়েনি। দুটো জানলাই খোলা, দুটো জানলা দিয়েই তো সমান হাওয়া আসার কথা।

বাইরে কিছুই দেখা যায় না। এমন হতে পারে, অন্য জানলাটার কাছেই কোনো বড় গাছ আছে কিংবা দেওয়াল টেওয়াল কিছু আছে, তাই হাওয়া বাধা পাচ্ছে। এ ছাড়া আর তো কোনো কারণ থাকতে পারে না।

এইসব কথা ভাবলেও সত্যি কথা বলছি, আমার বেশ ভয় করতে লাগল।

এখন আর বই পড়া যাবে না। দুটো জানলায় ভালো করে ছিটকিনি এঁটে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

একটু পরেই মনে হল, জানলায় কেউ ঠক ঠক করছে।

আমি মনে-মনে বলতে লাগলাম, কেউ না। কেউ না। ওটা ঝড়ের শব্দ, বাতাসের ধাক্কা। তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় সেই প্রথম জানলাটার পাল্লা খুলে গেল হাট করে, ঝোড়ো বাতাস ঘরের মধ্যে যেন তাণ্ডব শুরু করে দিল। ঝনঝন শব্দে পড়ে ভেঙে গেল দেওয়ালের ছবিটা।

আমি দারুণ ভয়ে আঁ-আঁ চিৎকার করে উঠলাম।

অন্য জানলাটায় একটুও শব্দ নেই, বাতাসের ঝাপটা নেই। তা হলে এ নিশ্চয়ই অলৌকিক কাণ্ড।

শঙ্কর নেই, তবে কি তার প্রেতাত্মা দেখা করতে চায় আমার সঙ্গে? অর্থাৎ ভূত।

এতকাল ভূতে বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন ভয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছে সর্বাঙ্গ। সত্যিই মনে হচ্ছে, অন্ধকার ঘরের মধ্যে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেড সুইচটা টিপে আলো জ্বালতেই অবশ্য দেখা গেল, ঘর খালি। কেউ নেই, এলোমেলো বাতাস বইছে শুধু ছবিটা পড়ে ভেঙে গিয়েছে।

এবার আমি ঠাস করে নিজের গালে একটা চড় কষালাম।

যদি শঙ্কর ভূত হয়ে এসেও থাকে, তাতে আমার ভয় পাওয়ার কী আছে? শঙ্কর আমার অতি প্রিয় বন্ধু ছিল, সে কি আমার কোনো ক্ষতি করবে? কখনও না।

ছেলেমানুষের মতন ভয় না পেয়ে আমার ধৈর্য ধরে দেখা উচিত। ভূত আছে না নেই, তার প্রমাণ হয়ে যাবে। নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভূত হলে ভয় পাওয়ার কোনো কারণই নেই। তার কাছ থেকে ভূতেদের ব্যাপারস্যাপার সব জেনে নেওয়া যাবে।

নিজেকে চড় মারার ফলে অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলাম। খুলে দিলাম দুটো জানলার পাল্লা। আসুক হাওয়া। আরও যদি কেউ আসতে চায় তো আসুক।

বিছানা ছেড়ে চেয়ারে বসলাম বইটা নিয়ে। জোরে বললাম, "শঙ্কর আয়, দেখা দে। কিংবা যদি কিছু বলতে চাস, বল। আমি ভয় পাব না। আয় শঙ্কর, আয়, তোর সঙ্গে আমার অনেক গল্প বাকি আছে।"

তারপর মাঝে-মাঝে জানলার দিকে তাকানো, এইভাবে কেটে গেল সারারাত। চেয়ারে বসে। কেউ এল না। কেউ কিছু বলল না। শঙ্কর দেখা দিল না।

রবির কুকুর

কী ওরা খাওয়াল কুকুরটাকে কে জানে, কুকুরটার হঠাৎ ডাক বন্ধ হয়ে গেল!

আট বছরের পোষা কুকুর, বাইরের কোনো লোক খাবার দিলে সাধারণত খায়ও না। তবুও ও খেল কেন? খাবারটাও তা হলে এমন কিছু ছিল, যাতে কোনো কুকুর লোভ সামলাতে পারে না।

এসেছিল তিনজন লোক। একজন কুকুরটাকে সামলেছে, আর দু'জন পেছনের বাগান দিয়ে ঢুকে রেলিং বেয়ে দোতলার বারান্দায় উঠেছে। যে দুটো ঘরে অন্য সবাই ঘুমোয়, সে দুটো ঘরের দরজাই বন্ধ করে দিয়েছে বাইরে থেকে। কোণের ঘরটায় ঘুমোন শুধু বাবা একা। তাঁর মাথার কাছে টেবিলের দেরাজে থাকে রিভলবার। শুধু চোর-ডাকাতের ভয় না, এই জায়গাটাতে খুব সাপ আর নেকড়ে বাঘের উপদ্রব। মাত্র দু'মাস আগে তিনি এখানে বদলি হয়ে এসেছেন। পাহাড়ী জায়গা, খুব কাছেই জঙ্গল।

একটা আওয়াজ পেয়ে বাবার ঘুম ভেঙে গেল। উনি পাশ ফিরে চোখ মেলতেই জোরাল টর্চের আলো পড়ল তাঁর মুখে। একজন কেউ হিস্ হিস্ করে বলল, চুপ! একটু নড়লেই একেবারে খতম করে দেব! বাবা তবু মাথার দিকে হাত বাড়ালেন। তখনই ওদের কেউ কোনো একটা ভারী জিনিস দিয়ে বাবার মাথায় মারল।

তাতে বাবা জ্ঞান হারালেন না বটে, তবু অজ্ঞান হবার ভান করে রইলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে আর কিছু করতে গেলে ওরা তাকে মেরেই ফেলবে। সেই অবস্থাতেও বাবা ভাবতে লাগলেন, কুকুরটা কোথায়? অত বিশ্বাসী কুকুর!

বাবা টের পেলেন, ওরা আলমারি খুলে অনেক কিছু বার করে নিচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি ওরা কাজ সেরে বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে বাবা ধড়মড় করে উঠে দেরাজে হাত ঢোকালেন। সেটা খালি। রিভলবারটাও ওরা আগেই নিয়েছে।

তিনি ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে দেখলেন দরজা বন্ধ।

একবার ভাবলেন চোর চোর বলে চ্যাঁচাবেন। তারপরই ভাবলেন, ওদের কাছে রিভলবার আছে। যদি ফিরে এসে গুলি করে।

অসহায় ভাবে চুপ করে রইলেন তিনি।

টের পেলেন বাগানে ওদের পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সব চুপ চাপ হয়ে গেলে তিনি দরজায় দুম্ দুম্ করে ধাক্কা দিতে লাগলেন। নীচের তলায় একজন কাজের লোক আর একজন রান্নার লোক থাকে। দু'জনেই

ঘুমোয় কুম্ভকর্ণের মতন। অনেকক্ষণ পরে আওয়াজ পেয়ে তারা ওপরে উঠে এল।

ততক্ষণে ডাকাতরা চলে গেছে অনেক দূরে।

বাবা দারুণ সাহসী আর গোঁয়ার। সেই রাত্রেই তিনি থানায় খবর দিতে যেতে চান। থানা এখান থেকে তিন মাইল দূরে। বাবার জিপ গাড়ি আছে।

মা কান্নাকাটি করতে লাগলেন।

জিনিসপত্র যা যাবার তো গেছেই, কিন্তু ওরা সাংঘাতিক ডাকাত। যদি কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থাকে? যদি জিপ গাড়ি দেখে গুলি চালায়!

বাবার মাথার চুলের এক পাশে রক্ত জমে আছে, ওরা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মেরেছে।

রবি ঘুম ভেঙে প্রথমে কিছু বুঝতেই পারে নি। তাদের বাড়িতে ডাকাত এসেছিল? ডাকাত কী রকম দেখতে? হাতে স্টেন গান ছিল? মাথায় পাগড়ি বাঁধা ছিল? ইস, একটুর জন্য ডাকাত দেখা হলো না।

বাবা বললেন, রবি, তোর কুকুর কী করছে দ্যাখ তো, একবারও তার সাড়া পেলুম না।

রবির কুকুর ভুলুকে রাত্তির বেলা ছেড়ে রাখা হয়। সারা রাত্তির সে ইচ্ছে মতন বাড়ির মধ্যে কিংবা বাগানে ঘোরে। সত্যিই তো, ভুলু থাকতে বাড়িতে ডাকাত এল কী করে? কোথায় ভুলু?

দেখা গেল, বাগানের মাঝখানে ভুলু অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

রবি গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকল কয়েক বার। তবু সে চোখ মেলে না। তা হলে কি ভুলু মরে গেছে?

রবির প্রায় কেঁদে ফেলার মতন অবস্থা।

রান্নার ঠাকুর ভব এসে বললে, ও খোকাবাবু, ভুলু মনে নি, ওকে বাণ মেরেচে।

বাণ মানে তীর, কিন্তু ভুলুর গায়ে তো কোনো তীর বিঁধে নেই।

ভব বলল, এ হলো অদৃশ্য বাণ। মন্ত্র দিয়ে ছোঁড়ে।

যাই হোক, সারা রাত জুড়ে তো অনেক হৈ হৈ হলো। বাবা সত্যিই জিপ নিয়ে শেষ রাত্রের মধ্যেই পুলিস ডেকে আনলেন। পুলিস বাবাকে বলল, আপনার কোনো চিন্তা নেই, সার। এ ডাকাত ঠিক ধরা পড়বেই।

পরের দিন ভুলুর ঘুম ভাঙল বেলা দশটায়। কিন্তু সে বোবা হয়ে গেছে। করুণ ভাবে রবির দিকে তাকিয়ে লেজ নাড়তে লাগল।

রবি কেঁদেই ফেলল।

টাকা পয়সা জিনিসপত্র যা ডাকাতি হয়ে গেছে সে সম্পর্কে রবির কোনো দুঃখ নেই, সে তো বড়দের ব্যাপার। কিন্তু তার কুকুরটাকে ডাকাতরা বোবা করে দিয়ে গেল!

ভব বললে, চিন্তা করো না খোকাবাবু, আমি একজন সাধুবাবাকে চিনি, তার কাছে নিয়ে যাব। সে উলটো মন্ত্র পড়ে দিলেই তোমার কুকুরের মুখ খুলে যাবে।

রবি বলল, এখুনি চলো সেই সাধুবাবার কাছে। মা কিন্তু অনুমতি দিলেন না কোনো সাধু আবার কুকুরের চিকিৎসা করে নাকি? যত সব বাজে কথা। সাধু সন্ন্যাসীরা তো কুকুর সহ্য করতেই পারে না! তা ছাড়া বাড়িতে এরকম বিপদ, এখন রবির বাইরে কোথাও যাবার দরকার নেই।

কিন্তু ভুলু বোবা হয়ে গেছে তা-ই নয়। সে কিছু খেতেও পারছে না। খাবার দেখলেই সে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

এ রকম হলে তো ভুলু দু'দিনেই মরে যাবে!

মা আর বাবা খুব ভালোবাসেন ভুলুকে। কিন্তু এই রকম জায়গায় তো কোনো কুকুরের ডাক্তার পাওয়া যাবে না।

পরের দিনও যখন ভুলু কিছু খেল না কিংবা একবারও ডাকল না, তখন মা ভবকে বললেন, কোথায় তোমার সাধু? তা হলে সেখানেই ভুলুকে নিয়ে যাও একবার।

জঙ্গলের ধারে একটা বট গাছতলায় সাধুর আখড়া। দিনের বেলাতেও আগুন জ্বালিয়ে সাধুজী সেখানে বসে ধ্যান করেন। পাশেই একটা ছোট নদী।

ভুলুকে কোলে করে রবি সেখানে এল ভবর সঙ্গে। সাধুজী তো চোখ বুজেই বসে

রইলেন অনেকক্ষণ। তখন কথা বলা যাবে না।

একটু পরে সাধুজী চোখ চাইলেন।

কী ব্যাপার?

ভব গিয়ে সাধুজীর কানে কী যেন ফিস ফিস করে বলল।

সাধুজী তা শুনে বললেন, হুম্! তোমার আস্পর্ধা কি যে তুমি একটা কুকুর এনেছো আমার কাছে? এক্ষুনি অভিশাপ দিয়ে তোমাদের ভস্ম করে দিতাম, খুব জোর বেঁচে গেলে এই জন্যে যে, এটা আসলে কুকুর নয়। এ আসলে ছদ্মবেশী গন্ধর্ব। গত জন্মে সামান্য একটা পাপ করায় কুকুর হয়ে আছে।

তাই শুনে রবি খুব খুশি। সত্যিই তো, ভুলু যেন কুকুর নয়। অনেকটা মানুষের মতন।

সাধুজী খানিকটা চরণামৃত মন্ত্র পড়ে একটা শাল পাতার ঠোঙায় রেখে দিয়ে বললেন, এটা ওকে খাইয়ে দাও।

কিন্তু খাওয়ানো যাবে কী করে! ভুলু তো কিছুই খায় না, এমন কি জলও না।

সাধুজী বললেন, জোর করে খাওয়াও।

রবি আর ভব দু'জনে মিলে ভুলুর মুখখানা জোর করে খুলে ধরল আর সাধুজী সেটা খাওয়াতে গেলেন। কিন্তু ভুলু কিছুতেই খাবে না। এতক্ষণ একেবারে নিস্তেজ হয়েছিল, এবার দারুণ ঝটাপটি করতে লাগল। তারপর এক ঝটকায় ওদের হাত ছাড়িয়ে লাফিয়ে পড়ল নদীতে।

রবির বুকটা ধড়াস করে উঠল। যাঃ কী হবে? ভুলু ডুবে যাবে!

কিন্তু সব কুকুরই জন্ম থেকে সাঁতার জানে। ভুলু নদীতে কয়েকবার ডিগবাজি খেয়েই হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল।

রবির মনে হলো এমন মিষ্টি আওয়াজ সে কখনও শোনে নি।

নদীর জলে পড়ার ফলেই ভুলুর ক্ষমতা ফিরে এসেছে। এবার ওপরে উঠে সে ছুটল বাড়ির দিকে। রবি আর ভবও গেল তার পেছনে পেছনে।

বাড়িতে পৌঁছে বাগানে যে-জায়গাটায় ডাকাতরা ওকে বিষাক্ত খাবার খাইয়েছিল, সেখানে ভুলু গড়াগড়ি দিল কয়েকবার।

তারপর বাঘের মতন লাফিয়ে কামড়ে ধরলো ভবর গলার টুঁটি।

ভব আর্তনাদ করে বলে উঠল ওরে বাবারে মরে গেলাম রে। ছাড়, ছাড়, আমি সব বলে দিচ্ছি।

বাবা ওপর থেকে দেখছিলেন, তরতর করে নেমে এলেন। ভবর গলা দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। ভুলু তখনও হিংস্র চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

ভব স্বীকার করে ফেলল, যে সে ডাকাতদের চেনে। সে-ই তাদের পথ দেখিয়ে এনেছে। ঐ সাধুজীও ওদের দলের। আরদু'জন আছে শিলিগুড়িতে।

পরে ধরা পড়ল সবাই। শুধু রবি একটা ব্যাপারে নিরাশ হলো। ডাকাতদের ঐ ভব কিংবা সাধুবাবার মতন সাধারণ দেখতে? ধুৎ!

কবিতা ও ছড়া

খাঁটি বাঘের মাসি

যারা কুকুর পোষে তারা পুষুক, তারা
পুষুক যত খুশি
আমরা একটা বেড়াল বড্ড ভালবাসি
নামটাও তার পুষি!
পাশের বাড়ির কুকুর দুটো যমের দূত
নিষ্ঠুর মাংসাশী
আমাদের এই মোটকা পুষি গাবগুবাগুব
খাঁটি বাঘের মাসি!
কুকুর দুটো রাস্তা ভুলে এক বিকেলে
ওদের বাড়ি ছেড়ে
জগাই-মাধাই আমাদেরই ছাদে ঘুরছে
আর বাঁচাবে কে রে?
দুই দিকে দুই নেকড়ে-মুখো হামলে এল
এবার বুঝি মলুম!
ঠিক তখনি সাদা বেগুনি রোঁয়া ফোলানো
পুষি ডাকল হালুম!
বাঘের মাসি বাঘের পিসি ছোট্ট পুষির
চোখে ছুরির ধার,
কুকুর দুটো কুঁই কুঁইয়ে লেজ গুটিয়ে
হল পগার পার!
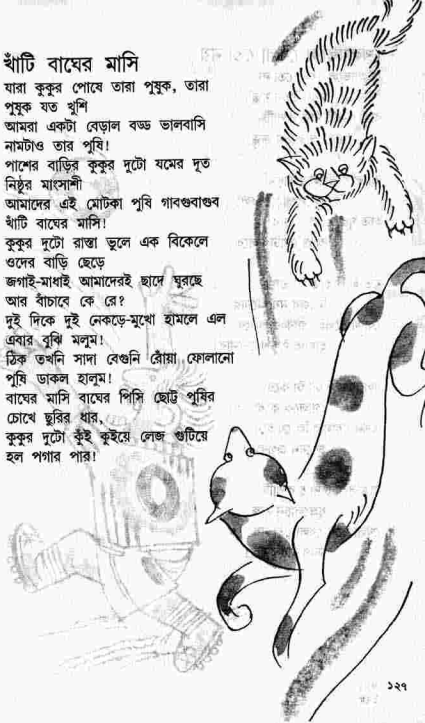
খেলাচ্ছলে খেলা তো নয়

খেলাচ্ছলে খেলা তো নয়
মরণ বাঁচন যুদ্ধ
বাঙাল-ঘটি দাঁত কপাটি
ধূম্রলোচন ক্রুদ্ধ!

ভালোয় ভালোয় যাদুমণি
গোলে পাঠাও বলকে
হাত ঘুরঘুর নাড়ু দেব
আস্ত গোটা দলকে!

যত ইচ্ছে হাত পা ভাঙো
নিজের নয় অন্যের
বোকা হলেই জোকার শুনবে
হাজার পঁচিশ সৈন্যের।

বল্‌কে যদি চ্যাপ্টা করো
গোলকে করো লম্বা
তখন তোমার কি যে হবে
জানেন জগদম্বা।

বাঙাল-ঘটি দাঁত কপাটি
ধূম্রলোচন ক্রুদ্ধ
খেলাচ্ছলে খেলা তো নয়
মরণ বাঁচন যুদ্ধ!

বাবা আর মা

বাবাও নাকি ছোট্ট ছিলেন
মা ছিলেন একরত্তি
ঠাম্মি দিদু বলেন, এসব
মিথ্যে নয় সত্যি।
বাবা ছিলেন আমার সমান
টুয়ার সমান মা
বাবা চড়তেন কাঠের ঘোড়ায়
মা দিতেন হামা।

বাবা ছিলেন দস্যি ছেলে
মা খুব ছিচকাঁদুনে
বাবা খেতেন কানমলা খুব
বিশ্বাস হয় শুনে?
আমি ছোট, বুবুন ছোট
টুয়া, জিয়া আর ভাই
মায়েরা সব মায়ের মতন
বাবারা সব বাবা-ই।

লুপ্সুংশান

এক দিন কেউ তোমাকে বলল, লুপ্সুংশান!
তুমি কি ভাববে, এ কী উদ্ভট, লুপ্সুংশান?
এর মানেটা কী? নাকি কিছু নেই, এমনিই যা-তা
ছেলেটাকে দেখে মনে হয় বুঝি ছিটভরা মাথা?
তা তো নয় ঠিক, আয়নার মতো ওর মুখখানি
[illegible] হাসিতে যেন সে বলছে, পারবে না জানি!
কেন পারবে না? ভাবো ভাবো ভাবো, কুঁচকিয়ে ভুরু
ভাবনা-যুদ্ধে হেরে যাবে তুমি, বুক দুরুদুরু?

লুপ্সুংশান কীরকম কথা, রুশ না ফরাসি?
এই পৃথিবীতে রয়েছে তো ভাষা কত রাশিরাশি
সংস্কৃত না সাঁওতালি, নাকি হিন্দি, মারাঠি?
শব্দটা কিছু গোঁজামিল, নাকি একদম খাঁটি?
কিংবা এমনও হতেও তো পারে, বাংলা বা চিনে?
গোটা-পঞ্চাশ অভিধান তবে আনবে কি কিনে?
দেখে-শুনে যদি নানান ভাষার হরেক হরফ
মাথা বনবন, চাপাবে কি তবে ঠাণ্ডা বরফ?
লুপ্সুংশান, লুপ্সুংশান, শুনেছো কি আগে?
ভালো করে ভাবো, মনে কিছু সব জাগে কি না জাগে।

লুপ্সুংশান পুলিশ কিংবা অতি পচামাছ?
গেলাস ভাঙার শব্দ? অথবা ন্যাড়া তালগাছ?
হারানো বোতাম, চিঠির বাক্স, পুতুলের বিয়ে?
মহা মুশকিলে পড়া গেল এই কথাটিকে নিয়ে
অ্যালজেব্রা না ঘড়ির অঙ্ক লুপ্সুংশান?
ইতিহাসে কোনো শক-হুণ দল, আর্য, কুশান?
এ কী এ কী এ কী, হাত-পা ঝাঁকিয়ে বলে, ধুত্তোর
হাল ছেড়ে দিলে? পারলে না আর দিতে উত্তর?

শোনো তবে বলি, এমন সহজ কথা বুঝলে [illegible]
আর একটু মাথা চুলকে বুঝতে, এ যে [illegible]
কেউ যদি এসে বলে হাসিমুখে লুপ্সুংশান
তুমিও বলবে দুহাত বাড়িয়ে দুরুক দিটাং
আর যদি কেউ লুপ্সুংশান বলে রাগ করে
তুমিও ঠোঁটটা বেঁকিয়ে বলবে ডিংফরগরে।
লুপ্সুংশান এই শব্দের দু'রকম মানে
দুটোই সরল, তবে কথা এই যে-যেমন জানে।
লুপ্সুংশান, লুপ্সুংশান, কোন্ মানে চাও?
দুরুক দিটাং, ডিংফরগরে, নাও বেছে নাও!

পায়ের তলায় সর্ষে

আমার বাবার ঠাকুরদাদা কে শুক্কুরবারে
হঠাৎ যেন বদলে গেলেন বসে নদীর ধারে।
আমার বাবার ঠাকুরদাদা দারুণ স্বাস্থ্যবান
একটি ধামা মুড়ির সঙ্গে দশটা লঙ্কা খান।
গায়ের রংটি কালো হলেও রাগলে পরেই লাল
তন্ত্র মন্ত্র জানেন অনেক, নাচান কঙ্কাল।
সেই তিনি এক দুপুরবেলা ঝামরে মাথার চুল
বললেন, ওঃ, জীবনখানাই মস্ত বড় ভুল!
একই বাড়ি, একই উঠোন, মানুষজনও চেনা
প্রত্যেকদিন সব-কিছু এক, আর তো ভাল্লাগে না।
শুয়ে শুয়ে দেয়াল দেখা, দেয়াল নয়তো খাঁচা
খাইদাই আর বগল বাজাই, এর নাম কি বাঁচা?
এই না বলে নৌকো খুলে জোয়ার-জলে ভেসে
আমার বাবার ঠাকুরদাদা গেলেন নিরুদ্দেশে।

পেন্নাম
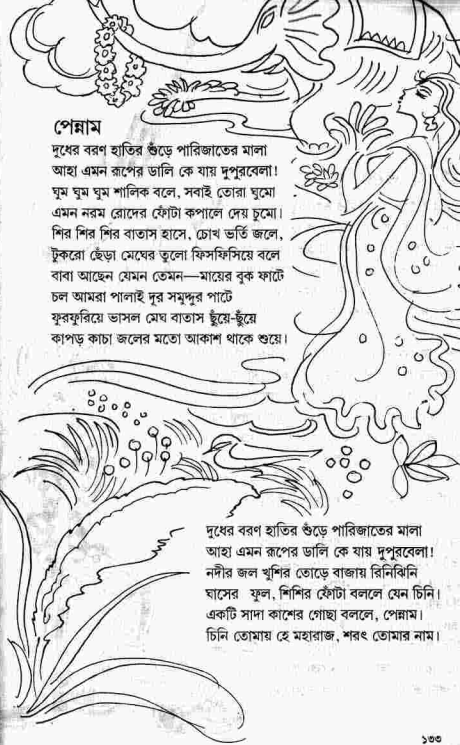
দুধের বরণ হাতির শুঁড়ে পারিজাতের মালা
আহা এমন রূপের ডালি কে যায় দুপুরবেলা!
ঘুম ঘুম ঘুম শালিক বলে, সবাই তোরা ঘুমো
এমন নরম রোদের ফোঁটা কপালে দেয় চুমো।
শির শির শির বাতাস হাসে, চোখ ভর্তি জলে,
টুকরো ছেঁড়া মেঘের তুলো ফিসফিসিয়ে বলে
বাবা আছেন যেমন তেমন—মায়ের বুক ফাটে
চল আমরা পালাই দূর সমুদ্দুর পাটে
ফুরফুরিয়ে ভাসল মেঘ বাতাস ছুঁয়ে-ছুঁয়ে
কাপড় কাচা জলের মতো আকাশ থাকে শুয়ে।

দুধের বরণ হাতির শুঁড়ে পারিজাতের মালা
আহা এমন রূপের ডালি কে যায় দুপুরবেলা!
নদীর জল খুশির তোড়ে বাজায় রিনিঝিনি
ঘাসের ফুল, শিশির ফোঁটা বললে যেন চিনি।
একটি সাদা কাশের গোছা বললে, পেন্নাম।
চিনি তোমায় হে মহারাজ, শরৎ তোমার নাম।

প্রশ্ন ও উত্তর

চাকরি পাবে মোহনকুমার সব-কিছু ঠিকঠাক
প্রথম দিনেই আছাড় খেয়ে নাক ফুলে জয়ঢাক!
দু'দিন বাদে অফিস গেলে কী হল তার দশা?
নাক-সরু এক স্বপনকুমার তার চেয়ারে বসা!
কেন এমন হল, আহা, কেন এমন হল
কোন দোষে হায় মোহনবাবুর চাকরিখানা গেল?

রকেট চালিয়ে বাঙালির ছেলে পাড়ি দেবে নাকি চাঁদে?
বিজয়কুমার পুরোপুরি রেডি, তবু কি ফ্যাসাদ বাধে?
জুতোয় একটা পেরেক উঠেছে, সে খেয়াল নেই তার
বেলুনের মতো ফোস্কা পড়ল পায়ে জুতো রাখা ভার
খালি পায়ে কেউ চাঁদে যায় নাকি, রকেট নিল না তাকে
বিজয়কুমার ফ্যালফ্যাল করে আকাশে তাকিয়ে থাকে!
কেন এমনটি হল যে আহা রে, কেন এমনটি হল?
বাঙালির কত নাম হত, তবু সুযোগ ফস্কে গেল!

লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল পুঁটিরাম
এইটুকু কাগজের পাঁচ লাখ টাকা দাম!
আহ্লাদে আটখানা হয়ে নাচে ধেই ধেই
টিকিটটা হাতে নিয়ে রাস্তায় নামে যেই
কোথা থেকে ঝড় এল, পুঁটিরাম নিঃস্ব
টিকিটটা পাখি হয়ে হল অদৃশ্য।
হায় হায় একী হল, এমনটি কেন হল?
পুঁটিরাম ভ্যাবারাম, সব টাকা জলে গেল!
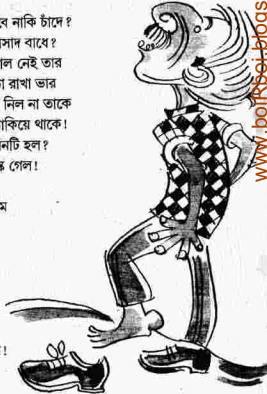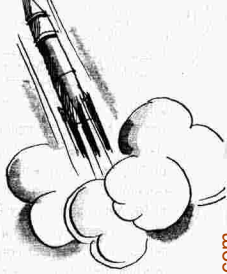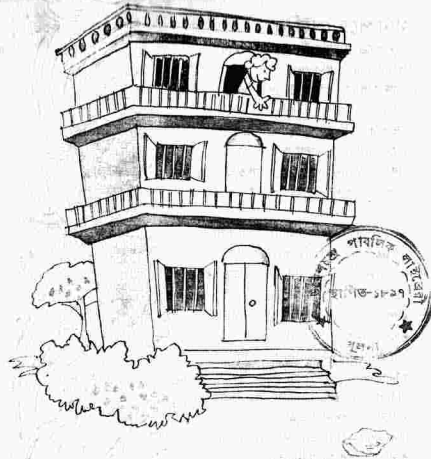
উত্তর : সাড়ে এগারো বছর বয়েসে পর পর দু'দিন তিনতলার
জানলা থেকে রাস্তায় আমের খোসা ছুঁড়ে ফেলেছিল কে?
মোহনকুমার, আবার কে?
দশ বছর তিন মাস বয়েসে একটা বেড়াল ছানার গায়ে আলপিন
ফুটিয়ে দিয়েছিল কে? বিজয়কুমার, আবার কে?
তেরো বছর পাঁচ মাস বয়েসে এক বন্ধুর একটা ডিটেকটিভ গল্পের
বইয়ের শেষ পৃষ্ঠা চুপিচুপি ছিঁড়ে দিয়েছিল কে? পুঁটিরাম আবার কে?
এতদিন পর সেই রাস্তা, বেড়ালছানা ও বই প্রতিশোধ নিল!

মনে পড়ে সেইদিন

মনে পড়ে সেইদিন শ্রী নামে সিনেমায়
পথের পাঁচালী ছবি দেখা
সঙ্গে ছিল না কেউ, বৃষ্টি বাদলা ছিল
গোটা হল ঘরে যেন একা।
ভেতরেও বৃষ্টিতে ভিজছে দুর্গা-অপু
মাঠে ঘাটে কাটে সারাবেলা
পুকুরের জল কাঁপে, বাতাসে সেতার বাজে
আকাশ ও পৃথিবীর খেলা।

একটু পরেই আর সিনেমা দেখি না আমি
নিজেই তো হয়ে গেছি অপু
কাশবনে লুটোপুটি, আরও দূরে যেতে যেতে
বাজাচ্ছি আম আঁটির ভেঁপু।
ইন্দিরা ঠাকরুণ আমারই তো বুড়িপিসি
মায়ের বকুনি খেয়ে হাসি
দিদির পেছনে আমি ছায়া হয়ে ঘুরিফিরি
পাঠশালা ফেলে ছুটে আসি।
বাবা বহুদিন নেই, আমাদের কিছু নেই।
মায়ের আঁচলখানা ভিজে
ঠিক এরকম ছিল আমাদের ছেলেবেলা
বুঝেছি খিদের জ্বালা নিজে।

হঠাৎ আকাশ ভেঙে বাদলধারার মতো
আমার দু'চোখে নামে জল
এমনই কান্নায় ভেজা, কাঁপে বুক থরথর
চারদিকে আঁধার অতল।
হল ছেড়ে ছুটে যাই বাইরে একলা কাঁদি
আজও মনে পড়ে সেইদিন
তারপর বহুবার বলেছি সে স্রষ্টাকে
আমার চোখের জল নিন।

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে।
ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর
বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার।
যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্র্যাক/কিজেন যুক্ত।
কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com